"স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোনদিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কোনদিন জয়ী হইবেও না।"—রামমোহন রায়।

রামমোহন

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা

Rammohun, A Bengali biography of
Raja Rammohun Roy, *By :* Moni Bagchee.

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮

প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র
সুবীর সেন

প্রকাশক শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ । কলিকাতা ২৯
৩৩ কলেজ রো । কলিকাতা ৯
মুদ্রাকর শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট । কলিকাতা ৪

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের

পুণ্য স্মৃতিতে

॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

মাইকেল

কেশবচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র

রমেশচন্দ্র

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

শিক্ষাগুরু আশুতোষ

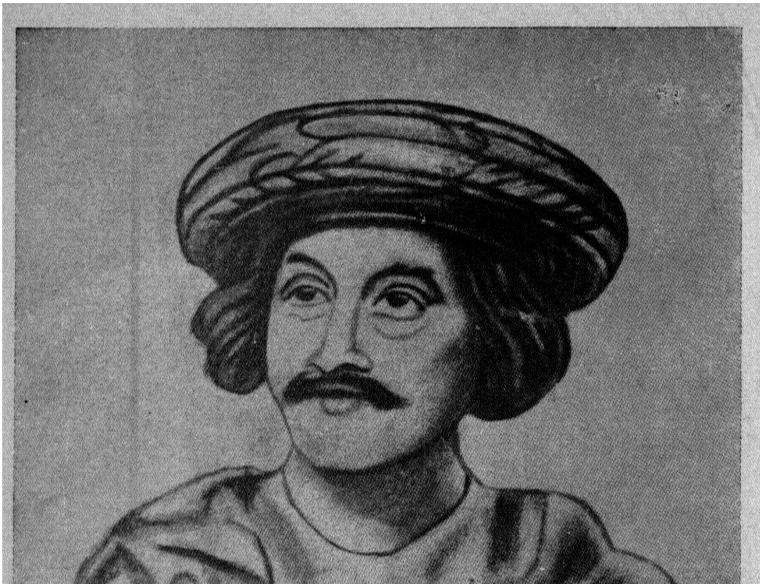
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার

॥ পরবর্তী বই ॥

জীবনীশতক

প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন শতাব্দীর
একশত চিন্তানায়কের জীবনালেখ্য।


Rammohun Roy



॥ এক

রামমোহন জাতির বীজপ্রদ পিতা।

'Rammohan Roy inaugurated the Modern Age in India'. 'ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের প্রবর্তয়িতা রামমোহন রায়।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটির সূত্র ধরিয়া আমরা এই যুগপুরুষের জীবন ও জীবন-সাধনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস মূলত নবজাগরণের ইতিহাস। রামমোহন সেই ইতিহাসের স্রষ্টা।

যে আধুনিক যুগের কথা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন এদেশে তাহার আরম্ভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ের সময় হইতেই। ইংরেজ শাসনাধিকারে আসিবার পর পুরাতন পচনশীল ভারতীয় সমাজের অন্তর ভেদ করিয়া ভারতে নূতন সমাজের আবির্ভাব কি ভাবে হইয়াছে, সেই ইতিহাস অল্প-বিস্তর সকলেরই জানা আছে। পলাশির যুদ্ধের পর হইতেই ভারতীয় সমাজ-কাঠামোয় মৌলিক রূপান্তর সাধিত হইতে থাকে। এই রূপান্তরের ফলেই প্রাচীন ভারতীয় সমাজের তিরোধান এবং নূতন একটি যুগের আবির্ভাব হইতেছিল। প্রাচীন সমাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীরও চিন্তামানসের তিরোভাব হয়। আর সেই তিরোভাবের অন্তরালে নূতন সামাজিক শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে। ইঁহারাই পরবর্তীকালে ভারতে নব-সংস্কৃতির পত্তন করিয়াছিলেন।

এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিনিধি রামমোহন।

এদেশে কোম্পানী-শাসন কায়েম হইবার পর হইতেই ধীরে ধীরে অথচ অনিবার্য গতিতে সমাজবিপ্লব অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার ফলে সমাজ-সংগঠন আমূল পরিবর্তিত হয় এবং পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্যক্তিমনের উন্মেষ হইতে থাকে। নূতন সমাজ-বিন্যাসের ভিতর হইতে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয় যে মানুষটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম দেখা দিয়াছিল তিনি রামমোহন। আকাশের সীমাহীন বিস্তারকে জানিবার স্পর্ধায় তিনি যেদিন প্রথম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন, সেইদিন হইতেই বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের সূচনা।

রামমোহন স্বীয় জীবনাচরণের যে মূল্যমান সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সর্ববিধ সংস্কার ও আচ্ছন্নতার কলুষমুক্ত ছিল। সেই বলিষ্ঠ যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়াই তিনি ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে পরিশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনদর্শন ছিল বাস্তব ব্যবহারিক জীবনের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই আলোকেই তিনি অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই আলোকেই তিনি বাস্তব জীবনের সাফল্য ও কল্যাণের পরিমাপে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে অনুরঞ্জিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্যক্তিমানসের দুর্জয় প্রাণশক্তি আর ভ্রূক্ষেপহীন অভিযানের পথেই রবীন্দ্রনাথ-কথিত আধুনিক যুগকে রামমোহন আহ্বান জানাইয়াছিলেন। এই আধুনিক যুগ নানাদিক দিয়াই এক মহাগৌরবময় যুগ।

এই আধুনিক যুগ বা নবযুগের চরিত্র সম্পর্কে প্রসঙ্গত দুই-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ভারতে এই নবযুগের প্রেরণা আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বন্দ্বে উদ্ভূত হয় নাই, ইহার উদ্ভব বাহিরের শক্তির আঘাতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থায় প্রাচীন আর্থিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইবার ফলে পুরাতন চিন্তা ও মূল্যমানের যে পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পরিণামফল বাংলা তথা ভারতের নবযুগ।

এই যুক্তি বিচার্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙালী জাতির মধ্যে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য বা নবজাগরণ ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে তাহার

একমাত্র কারণ বহিরাগত সভ্যতার প্রভাব বা সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা হইতে পারে না। একথা সত্য যে, ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বাঙালি জাতির উপর পরাক্রমশালী একটি বিদেশী সভ্যতা তাহার স্বতন্ত্র আদর্শ লইয়া আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, 'পাশ্চাত্য জাতির এই আঘাত—আঘাত মাত্র। আঘাত জাগরণ নয়। জাগরণ জাতির নিজের।' কোম্পানি-শাসনের আদিপর্বের ইতিহাস এমন সাক্ষ্য দেয় না যাহাতে আমরা বলিতে পারি যে, প্রচলিত কুসংস্কার বা ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার কোনো রকম পরিবর্তন নূতন শাসকদের একান্ত কাম্য ছিল। ইহা তাহাদের কাম্য হইতেও পারে না। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যেমন শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিকেই সমর্থন করিয়া চলিয়াছিল।

আমরা বরং এই কথা বলিতে পারি যে: 'These reform measures put a serious check on the further growth of the progressive forces in the social and ideological spheres of Indian life. In fact, the sum-total effect of such a policy as pursued by the Company during its rule, was that Indian society left towards retrogrssion instead of towards future progress.' * ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই কি অপরিহার্য হয় না যে, ভারতে ইংরেজ শাসনই ভারতবাসীর নবজাগরণের একমাত্র কারণ নয়? আসল কথা, ভিতরের প্রাণশক্তির তাগিদেই বাঙালি জাতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই আর একবার নিজেকে সম্প্রসারণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মুঘল শাসন হইতে কোম্পানি-শাসন—এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে 'বাঙালী জাতি তাহার জীবনধর্মের, তাহার স্বভাবধর্মের অনুবর্তী হইয়া আত্মপ্রকাশের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।' নবাগত বিরুদ্ধ-সভ্যতা তাহার এই জাতীয়

* *The Rise and fall of the East India Company*: Ramkrishna Mukherjee.

চাঞ্চল্যের আকার ও প্রকৃতিকে বহু অংশে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। বাহির হইতে যে আঘাত সেদিনকার সমাজ-জীবনের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা আবর্ত রচনা করিয়াছিল, শক্তি সঞ্চার করিতে পারে নাই। কারণ শক্তি জিনিসটা ভিতরের। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই নবজাগরণ দেখা দিয়াছিল। আধুনিক যুগে ভারতের অন্তর্নিহিত এই শক্তির সন্ধান সর্বপ্রথম পাইয়াছিলেন রামমোহন। এই শক্তি আত্মবুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানেব শক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোত যখন ভারতীয় সমাজের তটভূমিতে আসিয়া আঘাত করিল, তখন অসংশয়িত বাণীতে রামমোহন এই শক্তিরই জয় ঘোষণা করিলেন। ইহাই ভারতে নবজাগরণ বা আধুনিক যুগের অভ্যুদয়ের প্রকৃত কারণ।

রামমোহন যুগপুরুষ।

তিনি দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আশা এবং আলো লইয়া আসিলেন। একদিকে তিনি তাঁহার সমকালীন সমাজ-জীবনের জড়ত্বকে আঘাত করিলেন, অন্যদিকে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে 'চ্যালেঞ্জ' জানাইলেন রামমোহনের আবির্ভাব না ঘটিলে ভারতে মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির অবসান ঘটিত কিনা সন্দেহ। ইতিহাসে রামমোহনকে দাঁড় করানো হইয়াছে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা-রূপে। এই অভিমত মানিয়া লইলে রামমোহনের জীবনের সমগ্র সাধনাকেই অস্বীকার করিতে হয় কিম্বা তাঁহার বিবিধ কর্মপ্রয়াসকে লঘু করিয়া দেখিতে হয়। রামমোহন কি? নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক, না, সমাজসংস্কারক? আমার বিবেচনায়, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনিই একমাত্র সমর্থগুরু যিনি হিন্দুজাতির রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কথা ভাবিয়াছেন এবং সেজন্য নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এক্ষেত্রে আমি তাঁহাকে রামদাস ও শিখগুরু গোবিন্দসিংহের সমগোত্র বলিয়া মনে করি। রামমোহনের ইতিহাস-চেতনা ছিল প্রখর। তিনি জানিতেন দেশ ও জাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলে। Feudal বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নবাগত শাসকজাতির মনোভাব তিনি সর্বপ্রথম অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যযুগের চেতনাকে নবযুগের চেতনায় অনুরঞ্জিত করিতে গিয়া গোঁড়া হিন্দুসমাজ ও গোঁড়া খ্রীষ্টান সমাজ—

উভয়ের নিকটই তিনি ধিক্কৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য রামমোহনের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না।

আধুনিক ভারতের মানসলোকের বিবর্তনে চিন্তানায়ক হিসাবে রামমোহনের গুরুত্ব অসাধারণ। বাংলার হিন্দুসমাজে সামাজিক নীতি ও বোধ-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও রাজার প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। আবার বিশুদ্ধ রাজনৈতিক প্রেরণার জনক হিসাবেও রামমোহনের চিন্তার গুরুত্ব কম নয়। ভারতে নবযুগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগঠনের তিনি যেসব কথা বলিয়া গিয়াছেন সেগুলি অব্যর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মনেতা তিনি ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কে না জানে যে রামমোহন কাঠের মালায় জপ করেন নাই, তিনি আজন্ম জপ করিয়াছেন জাতিগঠনের মালায়? তিনি কথা বলিতেন অল্প, কাজ করিতেন বেশি। সেইজন্যই তিনি গঠনমূলক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

রামমোহনের আবির্ভাবের সময় হইতে দ্বান্দ্বিক অভিঘাতের ফলে যে নবযুগের সূচনা, সে যুগেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষত বাংলা দেশে বহু সাধক ও সিদ্ধপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু কাহারো মুখে ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক জীবনগঠন ও মুক্তিমোক্ষের শিক্ষা ব্যতীত জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পুনরুত্থান ও পুনর্গঠনের কোনো উপদেশ, নির্দেশ বা কর্ম-পরিকল্পনা পাওয়া যায় না, যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের ও ধর্মের কুসংস্কার বিদূরণের চেষ্টা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রামমোহনের বাণীর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি যে তিনি একজন সাধারণ সিদ্ধ পুরুষের মতো কাজ করিতে আসেন নাই। প্রখর অধ্যাত্মচেতনা সত্ত্বেও রাজার জীবনে মুক্তিমোক্ষ বা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জপতপ স্থান পাইল না, স্থান পাইল ভারতবর্ষ। তাঁহার জীবনব্যাপী বহুমুখী উদ্যম ও প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জাতির সামগ্রিক ও সার্বভৌমিক সংগঠন ও উত্থান। তৎকালীন দেশ, সমাজ ও জাতির ভগ্নদশা দেখিয়াই তো রামমোহন একাকী সংস্কার-যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। রামমোহন তাই প্রথমে জাতিসংগঠক, পরে ধর্মাচার্য। আধুনিক যুগে তিনিই

সংস্কারমুক্ত এক নূতন ভারতীয় জাতি ও সমাজের স্রষ্টা, নেতা ও নিয়ন্তা। দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ একমাত্র তাঁহারই চেতনায় প্রতিভাত হইয়াছিল। ভারত ও ভারতীয় জাতির সমস্যা সমগ্রভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন রামমোহন; তাইতো তাঁহার প্রত্যেকটি উক্তির মধ্যে এই জাতির পুনর্গঠনের সত্য এবং প্রকৃত দেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামমোহন আসিয়াছিলেন নেতা নিয়ন্তা নির্দেষ্টা-রূপে নয়, তিনি আসিয়াছিলেন মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে স্নেহময়ী মায়ের ব্যথিত একটি হৃদয় লইয়া। তিনি দেখিলেন, তাহার নিজস্ব ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও জাতি আজ ব্যাধিগ্রস্ত, পঙ্গু, মুমূর্ষু। তিনি বুঝিলেন, উপদেশ বা মতবাদ প্রচারের অবকাশ কম। তিনি হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিলেন—জাতির প্রয়োজন সেবা ও শুশ্রূষা। রামমোহন তাহাই করিলেন; পিতার ন্যায় পালনের এবং মাতার ন্যায় সেবার আগ্রহ ও আকুতি লইয়া মুমূর্ষু জাতির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রামমোহনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে তিনি চলিতেন সর্বনিয়ন্তার প্রেরণায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোতকে তিনি কদাচ গ্রাহ্য করিতেন না। কর্মক্ষেত্রে তিনি বহু দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাঁহাকে বহু নিন্দা ও সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি নিজস্ব প্রেরণা ও সংকল্প হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। দেশ ও জাতির যথার্থ কল্যাণ কোন পথে তাহা সেদিন একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। যে শক্তির দ্বারা তিনি দেশ, জাতি ও সমাজের পরিবর্তন ও সংগঠন চাহিয়াছিলেন, তিনি কখনো তাহার অপব্যয় করেন নাই।

'ঘোর-তিমির-ঘন' অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ করিয়া রামমোহন যেদিন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেদিন কে বুঝিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক মহাশক্তির ঘনবিগ্রহ আবির্ভূত হইলেন নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও নবীন সংকল্প লইয়া? কে-ই বা বুঝিয়াছিল যে, পাষাণী অহল্যার মতো মৃতপ্রায় ভারতবর্ষকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে পুনরায় জাগাইয়া তুলিবার জন্য একজন দ্বিতীয় রামের আবির্ভাব হইল আমাদের এই কালে? সেদিনের সেই নির্জীব ভারতের দিগন্তব্যাপী নৈঃশব্দ্য ও নিস্তব্ধতার মধ্যে যাঁহার কম্বুকণ্ঠে ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তির বাণী প্রথম যখন উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, তখনি

ভারতবাসী তাহাদের পরিত্রাতার সন্ধান পাইয়াছিল। খ্রীষ্টানী সভ্যতার উত্তাল প্লাবনকে যেদিন রাজা তাঁহার তর্জনীসংকেতে প্রতিহত করিয়া হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন একমাত্র সেদিনের কথাটি স্মরণ করিলেই রামমোহনকে জাতির পরিত্রাতা ভিন্ন আর কি বলিব?

যে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বিচারে, তাঁহার কালের বিচার প্রয়োজন; কারণ, ব্যক্তি সামাজিক-অস্তিত্ব বা ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। রামমোহনের কাল ও সামাজিক উৎস বিচার করিলে তাঁহাকে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর প্রতিভূ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব তাঁহার পরবর্তীকালের ঘটনা।) প্রায় তিনশত বৎসরের মুঘল শাসন তখন সবেমাত্র অবলুপ্ত হইয়াছে, ইংরেজ বণিক সভ্য শাসনদণ্ড হস্তে তুলিয়া লইয়াছে। স্বভাবতই দেশের সবস্তরে একটি নূতন পরিবেশের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেই পরিবেশে প্রাচীন চিন্তার পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। এই পুনর্বিচারের প্রেরণা সর্বপ্রথম স্পষ্ট ও প্রাণবন্তরূপে দেখা দিয়াছিল রামমোহনের মধ্যে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় রামমোহন একস্থলে বলিতেছেন: 'এ স্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্প-দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের কি যুক্তি দ্বারা বিচার করেন না, আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু একজনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে।' *

'একজনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না'—এই একটিমাত্র

* রামমোহন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ

উক্তি দ্বারা রামমোহন তাঁহার সমকালীন যুগের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে কি স্পষ্টভাবেই না প্রকাশ করিয়াছেন! ইহার দ্বারা তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন যে প্রকৃত সত্য নির্ণয় বা জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে বিশ্বাসকে আশ্রয় করিলে চলিবে না। তিনি আরো বুঝাইলেন লোকাচার ও ঐতিহ্য এক বস্তু নয়। ঐতিহ্য-নির্ণয়ের প্রয়োজনেই শাস্ত্রবিচারের প্রয়োজনীয়তা। সর্বোপরি শাস্ত্রকেও যুক্তির আলোকে বুঝিয়া লইতে হইবে—অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইলে চলিবে না। রামমোহনের এই উক্তির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় আধ্যাত্মিক সত্য নিরূপণে আর্থিক যাচাই-এর উপমার প্রয়োগ।

নবযুগের আর একটি মৌল বৈশিষ্ট্য—মানবিকতার বোধ। রাজার রচনা ও কর্মে ইহাও আভাসিত হইয়াছে। নারীর বাঁচিবার অধিকারের দাবীতে প্রকাশ পাইয়াছিল এই মানবিকতা। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে সেই দাবীই ছিল মানবিক অধিকারের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ রামমোহনের সেই মর্মস্পর্শী উক্তি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সতীদাহ প্রথা নিবারণ ইহার দশ বছর পরের ঘটনা। ইহাই বাংলা তথা ভারতের সমাজসংস্কারের প্রথম কীর্তি।

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা ব্যতীত চিন্তার স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় না। তিনি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বিপ্লবের ফলশ্রুতি যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোয় সম্ভব নয়, ইহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। নবযুগের দুর্বলতা অনুধাবন করিয়াই তিনি সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বিদেশীর সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী য়ুরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচারের মধ্যে রূপ লইয়াছে। তিনি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। রামমোহন-চরিত যাঁহারা একটু গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে, এই বিরোধিতার কারণটা শুধু খ্রীষ্টধর্মের ধর্মনীতি সংক্রান্ত ছিল না, খ্রীষ্টধর্মের আবরণে ভারতীয় জীবনবিন্যাসের উপর যে আক্রমণ ও অবজ্ঞার স্রোত বহিতেছিল, রামমোহন সেই স্রোতোধারাকেই

রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়াই না আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ দুই-ই সেদিন রক্ষা পাইয়াছিল। রামমোহনের এই কর্মোদ্যমকে আমরা ডিরোজিওর চিন্তাপ্রসূত ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই প্রতিক্রিয়া কি পরিমাণ তীব্র ছিল তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। মোটকথা, রামমোহনের জীবনে খ্রীষ্টীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে বাধা দিয়া জাতীয় ভাবাদর্শ রক্ষার প্রয়াস সুস্পষ্ট। জাতির লুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সেদিন তিনি যদি আত্মনিয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে মিশনারীদের প্রচারকার্য নির্বিরোধে চলিত।

রবীন্দ্রনাথ যেমন রামমোহনকে ভারতে আধুনিক যুগের প্রবর্তয়িতা বলিয়াছেন, তেমনি রাজার জীবনভাষ্যের অপর একজন ব্যাখ্যাতা, মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনকে 'The prophet of humanity' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিশ্বচারী মন ছিল রাজার; সেই মন এবং মনন কেবলমাত্র স্বজাতির সর্ববিধ উন্নতির কথা চিন্তা করিয়া নিরস্ত থাকে নাই, সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যাণের কথাও তিনি সমভাবে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে রামমোহন তুলনাহীন।

রামমোহনই আধুনিক কালে পৃথিবীর সেই মানুষ যাঁহাকে আমরা বলিতে পারি universal; তাঁহার প্রতিভার বিশ্বজনীনভাব রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন: 'Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity.' অন্যত্র কবি বলিয়াছেন: 'আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এ যুগের যে আহ্বান, সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান।'

ভারতের রামমোহন তাই আজ পৃথিবীর রামমোহন। তাঁহারই কণ্ঠে পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম শুনিতে পাইল সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। আর সেই আহ্বান ছিল রামমোহনের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া ভারতেরই আহ্বান। রাজার ভারতচিন্তার মধ্যে নিখিল বিশ্বের হিতচিন্তা ঐক্যের চিন্তা কেমন করিয়া বিধৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে পৃথিবীর সকল মহাদেশকে ভারতের সুপ্রাচীন অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা বুঝিতে না পারিলে রামমোহন-অনুশীলন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়. ইহা যেন আমরা বিশেষভাবে মনে রাখি।

রামমোহনের বিশ্বমানবতা বা Universal humanism সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন: 'In the panorama of modern culture and civilization three peaks stand out prominently, The first is represented by Rammohan Roy. He was the harbinger of the idea of Universal Humanism.' জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন পারস্পরিক ঐক্যের ভূমিতে আবদ্ধ হইবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বৈপ্লবিক চিন্তা বাংলা দেশের একজন মানুষের মস্তিষ্কের কোষে তরঙ্গ তুলিয়াছিল ; সেই তরঙ্গ স্থান ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আজ তাহার নিয়তি-নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে ধাবিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রামমোহনের বিশ্বজনীন বোধ ও বিশ্বমৈত্রী সম্পর্কে আর কি কোনো সংশয় থাকিতে পারে ?

রামমোহনের মন ছিল সর্বসংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চিন্তার ধারা ধর্মসমন্বয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল। তিনি তাহা যুক্তিবাদের দ্বারা পরিশোধিত করিয়া সমাজমানসে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি'র মর্মার্থ তাঁহার ন্যায় সে যুগে আর কে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন ? জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই ধর্ম। উপনিষদের যুগে এই ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন একজন ঋষি, আর আমাদের কালে এই মন্ত্রের উদ্‌গাতা রাজা রামমোহন রায়। এক গরিমাময় অভ্যুদয়ের পুরোধা তিনি। তিনি শুধু মানবগুরু নন, মানবতন্ত্রী। মানবতার জয়গান ছিল তাঁহার জীবনবেদ।

॥ দুই

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'রামমোহনেরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইল, তাঁহারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।' এই জ্ঞানাস্ত্র রামমোহন কোথায় পাইয়াছিলেন? একদিকে ভারতের উপনিষদ্, অন্যদিকে ভল্‌তেয়ার ও ভল্‌নি, মতাজাল মওয়াহেদ্দিন, ইঁহাদের নিকট হইতেই তিনি উহা আহরণ করিয়াছিলেন। রামমোহন গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বন্ধনমুক্ত মনের স্বাধীনতা অর্জন করিবার মন্ত্রই এই যুগের সাধনার বস্তু। তাই তিনি অন্ধবিশ্বাসের সকল অচলায়তনকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্রান্ত ও অলৌকিক শাস্ত্রকে যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে পুনর্বিচার করিয়া দেখিলেন। এখানে তাঁহাকে আমরা মার্টিন লুথারের ভূমিকায় দেখিতে পাই। তাঁহার সাধনা দ্বারা রামমোহন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় লইয়া আসিলেন নূতন প্রবাহ। যে নদী সজীব, যাহাতে প্রবাহ আছে, সে আপনার বেগে খাত কাটিয়া দুই তীরে সোনার ফসল ফলাইতে পারে, স্থবিরের মর্মের মধ্যে লইয়া আসিতে পারে প্রাণচাঞ্চল্য। তাহার সাগরসঙ্গমে যাইবার তাগিদ আছে, সাগরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উৎসাহ ও কৌতূহল সে অনুভব করে। রামমোহনের সাধনা ভারতবর্ষের চিত্তকে সেই স্বাধীন মন অর্জন করিবার মন্ত্র দিয়া গিয়াছে—যে মন পূর্বসূরীদের মীমাংসাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করে না, যে মন সত্যসন্ধিৎসু, যে মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। রাজার সাধনার প্রধান মূল্য মধ্যযুগের মনোভাব ও চিন্তাধারা হইতে ভারতবর্ষের মনকে মুক্তিদান। সেইজন্যই তাঁহাকে ভারতীয় রেনেসাঁ-আন্দোলনের উদ্বোধক অথবা নবযুগের সার্থবাহ বলা যাইতে পারে। রামমোহনের সাধনা দ্বারা ভারতবর্ষের চিত্তের আত্মপ্রসারণের শক্তি ও সম্ভাবনা সুদূরবিসারী হইয়াছিল।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ একদিন বহু পথ অতিক্রম করিয়া বাংলার তীরেও আসিয়া আঘাত করিল। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যগণ এই দেশেও একটি ছোটখাটো বিপ্লবের সূচনা সেই সময়ে করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল' গ্রন্থে ইহার চিত্র আছে। ডিরোজিও ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রে তাঁহার ছাত্রদের দীক্ষিত করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ তাঁহার মননশীলতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। তাহারা নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে, সমাজকে, ধর্মকে, রীতিনীতিকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞানে প্রাচীন ধর্ম ও সমাজকে সমূলে ধ্বংস করিয়া নূতন জেরুজালেম প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে, ফরাসী বিপ্লব সামাজিক জীবনে যে সমানাধিকারবাদের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার উপর বিশ্বাসবান রামমোহন, যুক্তিবাদী রামমোহন, সর্ববিষয়ে স্বাধীনতাকামী রামমোহন কেন এই আন্দোলনের সহিত সর্বান্তঃকরণে যুক্ত হন নাই, কেনই বা তিনি নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিয়াছিলেন? অথচ সজীব ও সতেজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া যাহাতে দেশবাসীর চিত্ত ও বুদ্ধি দীপ্তিলাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে আর কেহই তো এত সংগ্রাম করেন নাই, অজ্ঞানতার দুর্গমতায় রাজপথ রচনা করিয়া একক তিনিই তো অগ্রসর হইয়াছিলেন? লর্ড আমহার্স্ট যখন কেবল প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কলেজ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন রামমোহনই তীব্র প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনিই ডেভিড হেয়ারের সহিত প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহারই আন্দোলনের ফলে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া নব দিগন্ত উন্মেষের পথ প্রসারিত হইয়াছিল। এই দেশের সমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস তিনিই মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তবে যে পর্বত-প্রমাণ জড়ত্বের চাপে হিন্দুসমাজ প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল, তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া বিদেশের নূতন বিধান এবং নব-সংহিতাকে রামমোহন সর্বতোভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন নাই কেন?

এইখানেই রামমোহনের বৈশিষ্ট্য। তাঁহার চিত্ত ইতিহাস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল। তিনি জানিতেন, একদা এই ভারতবর্ষে একটি সজীব সভ্যতা ছিল, যে

সভ্যতা আরব ও মিশর হইয়া য়ুরোপ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং সেই সভ্যতার নিকট য়ুরোপ বহু জিনিস, এমন কি বিজ্ঞান পর্যন্ত, গ্রহণ করিয়া তাহার নবজাগরণকে সম্পূর্ণ করিয়াছিল। সেই ইতিহাস তাঁহার সময়ে মাটিচাপা পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের অতীত সমস্ত জ্ঞান ও সাধনাকে পরিহার করা তাঁহার ঐতিহ্যবাদী মনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কালের অনেক জড়ভার হিন্দুসমাজ ও শাস্ত্রের ভিতর জমিয়াছে, এই সত্যটি যেমন তাঁহার ন্যায় আর কেহ উপলব্ধি করেন নাই, তেমনি ভারতবর্ষের চিরপ্রবহমান মননধারা. তাহার চিরসাধনার বস্তুর প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের প্রমাণও তাঁহার ন্যায় আর কে দিতে পারিয়াছে? সুতরাং একদিকে তিনি যেমন অলৌকিক অভ্রান্ত শাস্ত্রকে দৈবলোক হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে যুক্তি ও বিচারের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সর্বশাস্ত্র মন্থন করিয়া, বেদান্তের ভাষ্য বাংলায় ও ইংরেজিতে প্রকাশ করিয়া হিন্দুসভ্যতার সারতত্ত্ব উদ্ঘাটিত ও উদ্ভাসিত করিবার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রামমোহন তাঁহার ঐতিহাসিক বোধকে বিসর্জন দিয়া, প্রাচীনের সমস্ত বস্তুকেই বিনাশ করিয়া, নূতন করিয়া সৃজন করিবার কল্পনায় মাতেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সত্য-সন্ধিৎসু মন অতীতের হীনতা ও জড়তাকে আঘাত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে নাই। তাঁহার মনন দিয়া, তাঁহার যুক্তি দিয়া, তাঁহার অনন্ত অধ্যবসায় দিয়া, তাঁহার তীক্ষ্ণ ধী দিয়া শাস্ত্রালোচনা করিয়া তিনি যে মণি আহরণ করিয়া দেশবাসীর নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেদিনের জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানস তাহার স্থির ও স্নিগ্ধ প্রভায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল—অন্য কোনো বস্তুর ক্ষণপ্রভা তাই সেদিন আর বহুজনকে চমৎকৃত করিতে পারে নাই। য়ুরোপীয় রেনেসাঁও রোম ও গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার সহিত যোগসাধন করিয়াই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐতিহাসিক বোধে অত্যন্ত সচেতন রামমোহনও তেমনি নূতন ও পুরাতনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। দ্বিধাহীন কণ্ঠে রাজা সেদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,' এবং 'আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ

করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।' রামমোহনের এই বিপ্লবী মনীষার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ একটি কথায় সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন : 'তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক. যতদূর পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই।'

রামমোহন যে রেনেসাঁর উদ্বোধন করিয়াছিলেন. এই দেশের চিত্তকে আত্মসঙ্কোচন হইতে, জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের অভিমুখে আত্ম-প্রসারণের ক্ষেত্রে, প্রবহমান জীবনের ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ আর তাহা আমাদের বিচারের অপেক্ষা রাখে না। রামমোহন যাহার সূচনা ঘটাইয়াছিলেন, শতাব্দীর পথ বহিয়া সমগ্র জাতীয় জীবনে তাহা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহাই আজ জানিবার বিষয়। রামমোহনের জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আজো স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত নহে। ইতিহাস, ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্র পারিবেশ দ্বারা প্রভাবিত জীবনধারা ও ঘটনাপুঞ্জ এবং সেই সঙ্গে অধ্যয়ন-মনন-অনুশীলন—এইগুলির দ্বারাই মহৎ মানুষের জীবনাদর্শ রচিত হইয়া থাকে। এই জীবনাদর্শ বাহিরের জীবনধারার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংশ্লিষ্ট, বহু ক্ষেত্রেই তাহা এক। যাঁহারা ইতিহাস-স্রষ্টা, তাঁহাদের জীবন অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনাদর্শই প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান।

রামমোহনের একক জীবনের সাধনার মধ্যে জ্বলিতেছে নিখিল মানব-সাধনার দীপাবলী। ভারতবর্ষ যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার যুগ-যুগান্তের ধ্যান যখন নির্জীব হইয়া আসিল, সেই সময় মশাল জ্বালাইয়া আসিলেন রামমোহন। বজ্র-গম্ভীর উদ্বোধন-মন্ত্রে তিনি আমাদিগকে জাগাইয়া দিলেন। শুধু জাগাইয়া দেওয়া নয়, অগ্নিময়ী দীক্ষার মাধ্যমে নবপ্রাণ সঞ্চারিত করিলেন ভারতবাসীর মধ্যে। রামমোহনের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

রামমোহনের অন্যতম এবং অনেক বিষয়ে অনেকের চেয়ে প্রধানতম উত্তরসাধক কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন: 'So long as the real secret of the grand idea of Rammohan Ray's mind is not apprehended in all its comprehensiveness and greatness, his theological speculations will continue to be an intricate problem.' কথাটি অতি সত্য। রামমোহনের বহুমুখী চিন্তা ও সাধনার কথা আলোচনা করিবার পূর্বে তাই তাঁহার মানস-জীবনের কাঠামোটি আমাদের সম্মুখে স্থাপন করা দরকার। রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব-চিত্রাঙ্কণ প্রয়াস, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার মানস-জীবনের বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করিতে হয়। তাঁহার জীবনের কাহিনী পরে বলিব, এখানে তাঁহার অন্তর্জীবনের ছকটি তুলিয়া ধরিলাম। রামমোহনকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'বহুমুখীব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন একটি মানুষ' আখ্যা দিয়াছেন। ভারতের বহুধা-বিচিত্র জাগ্রত জীবনের পৃথক পৃথক সূত্র অন্বেষণ করিতে হইলে রামমোহনের বহুমুখীব্যক্তিত্বকে পৃথক করিয়া এক-একটি ব্যক্তিত্বের কর্মজীবনকে অনুধাবন করিতে হয়।

রামমোহন হুগলী জেলায় এক সম্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জমিদার; পিতামহ নবাব সরকারের কর্মচারী ছিলেন। যে পরিবারে রামমোহনের জন্ম, আমরা দেখিতেছি, তাহা যথেষ্ট বৈষয়িক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরিবার। সুতরাং তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাজটি ভালই হইয়াছিল। তদানীন্তন কালের শিক্ষারীতি অনুযায়ী তিনি ফার্সী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। উভয়বিধ শিক্ষার ফলে তিনি একদিকে সুফী দর্শন, আর একদিকে বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইংরেজ শাসনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্মের সহিতও পরিচিত হইলেন এবং স্বভাবসুলভ উন্মুক্ত মন লইয়া এই ধর্মের সারমর্ম অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের চেয়ে বড়ো কথা, ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া রামমোহন য়ুরোপের নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, নূতন ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। য়ুরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন, পুঁজি-

তন্ত্রের উদ্ভব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা—এই বিষয়গুলি রামমোহনের মনের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস্, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশ ছিল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। এইসব দেশে যে আন্দোলন চলিতেছিল, রামমোহন তাহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অসুবিধা সত্ত্বেও একটি ত্রিবর্ণপতাকা-শোভিত ফরাসী জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। নেপলস্-এর জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়-বার্তা শ্রবণ করিয়া তিনি আক্ষেপ করেন, 'নেপলস্-এর পরাজয় আমার নিজের পরাজয়।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, 'জনগণের এই পরাজয় সাময়িক। স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোনোদিন জয়ী হয় নাই এবং শেষপর্যন্ত কোনোদিন জয়ী হইবে না।'

ইংলণ্ডের সংস্কার বিল আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—'অভিজাত শ্রেণীর বিরাট প্রতিপক্ষতা ও রাজনীতিক সুবিধাবাদ সত্ত্বেও সংস্কার বিল আন্দোলন যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, ইহাতে আমি অতীব আনন্দিত।'

রামমোহনের এই কথাগুলিই প্রমাণ করিতেছে যে, তিনি শুধু সময়ের দাস হিসাবে ইংরেজ শাসন ও তাহার প্রবর্তিত নিয়মকানুন মানিয়া লন নাই। তিনি ইংরেজকে, য়ুরোপকে দেখিয়াছিলেন এক নূতন অগ্রগামী সমাজের অগ্রদূত হিসাবে। জাতীয়তাবাদী যে দৃষ্টিভঙ্গি রামমোহন য়ুরোপ হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি ভারতের প্রতিটি জাতীয় সমস্যার বিচার করিতেন। রামমোহনেব জীবনের আন্তর্জাতিক পটভূমিকাটি রামমোহন-জীবনীর আলোচনার একটি অপরিহার্য সূত্র। তাঁহার জন্ম ও জীবনকাল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগ-পরিবর্তনের সময়। এই যুগ-সন্ধিকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যমূলক উপনিবেশতন্ত্রে ভাঙন ধরিয়াছে এবং আরম্ভ হইয়াছে প্রজাতন্ত্র ও জাতীয়তার যুগ। এক-একটি রাজ্যের পতন হইতেছে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যাইতেছে; তাহার স্থলে জন্মগ্রহণ করিতেছে একটি বা একাধিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

রামমোহন যখন বাঙলায় রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যখন বাল্যকালে তিনি হিন্দী, উর্দু, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন, সেই সময়ের মধ্যেই ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক অধীনতা সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। যখন তিনি ধর্মবিষয়ে মতভেদের জন্য গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সুদূর তিব্বতে পাড়ি দিতেছেন, সেই সময়ে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্ব আরম্ভ হইতেছে। ব্রিটিশ ভারতের ভিতরে ও বাহিরে, নানা স্থানে ভ্রমণ শেষ করিয়া এবং পাঁচটি ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া রামমোহন রায় যখন রংপুরে আসিয়া ডিগ্‌বির অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়া ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় পূর্ণ মনোনিবেশ করিতেছেন, তখন ফরাসী বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শেষ হইয়াছে। আবার দেখিতে পাই, রামমোহন যখন ইংরেজির মাধ্যমে পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইতেছেন ও য়ুরোপ-আমেরিকার স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা স্বাধীনতা লাভের জন্য কিভাবে সংগ্রাম করিতেছে তাহার সংবাদ লইতেছেন, সেই সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাব্যাপী বিরাট স্পেনীয় উপনিবেশ-সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়াছে। তারপর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার স্থায়ীভাবে বসবাস ও ইহার পনর বৎসর পর বিলাত যাত্রা এই সুদীর্ঘ কালেও আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বহু আন্তর্জাতিক জাগরণ ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম লক্ষ্য করি। রামমোহনের জন্ম ও তাঁহার কর্মজীবনের প্রেক্ষাপটটি, এইসব বিবিধ আন্তর্জাতিক ঘটনা দ্বারা বিশেষভাবেই চিহ্নিত হইয়াছিল।

শুধু ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যেই নয়, দর্শন ও রাজনীতিতেও রামমোহন সেকালে তুলনাহীন জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তাই না তিনি প্রতীচ্য ভাষার মাধ্যমে এ-দেশীয়দের প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তোলার প্রবল দাবী লইয়া লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখিতে পারিয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক পত্রে রামমোহন লিখিয়াছিলেন : 'ব্রিটেনে এক সময়ে যেমন পুরাতন জীবনদর্শন বর্জন করিয়া বেকনের নুতন জীবনদর্শন প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল, ঠিক তেমনি ভারতেও বর্তমান অবস্থায় মধ্যযুগের পিছুটান অতিক্রম করিয়া নূতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।' সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা

করিয়া তিনি লিখিলেন : 'এই শিক্ষা ভারতকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিবে'। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান অভিযোগ, এই দর্শন নেতিবাচক। ইহার পরিবর্তে তিনি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইংরেজিকে এই নূতন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত মনে করিতেন।

রামমোহন-প্রচারিত ভাবধারা রক্ষণশীল পণ্ডিতদের তীব্র আক্রমণের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রক্ষণশীল মতবাদের প্রতিনিধিদের মত সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া রামমোহন স্বীয় মত স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সতীদাহ, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ. জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে—এক কথায়, সামন্ততান্ত্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তিমূলে তিনি আঘাত করিয়াছিলেন। অপরদিকে, খ্রীষ্টান মিশনারি-প্রচারিত অবৈজ্ঞানিক, রহস্যবাদী ভাবধারারও তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। এই কারণেই তাঁহাকে পাদ্রীদের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এই হিন্দু ও খ্রীষ্টান গোঁড়ামি পরিহার করিয়া প্রগতিশীল ও সর্বজনীন ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন একটি সমাজ-সংস্কার-আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাই ব্রাহ্ম-আন্দোলন। এই আন্দোলন হইতে পৃথক করিয়া রামমোহনের মূল্য নির্ধারণ যেমন অসম্ভব, তেমনি এই আন্দোলনের পূর্ণ পরিচয়ের ভিতর দিয়াই রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করিতে হইবে। তাঁহার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপ্রয়াস এই আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল বলিয়াই বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে ইহা এক প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিয়াছিল।

এই নব-প্রবর্তিত সংস্কার-আন্দোলন বেদান্ত ও উপনিষদের নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করিল, সকল ধর্মের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধ, সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহা ছিল এই আন্দোলনের সারবস্তু। নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রামমোহনের কণ্ঠস্বর সজোরে ধ্বনিত হইয়াছিল, জাতিভেদের বিরুদ্ধেও। রাজনীতিক্ষেত্রে একজন সংস্কারবাদী হইলেও একথা সত্য যে রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক বা সমর্থক ছিলেন না। যখনই ভারত-

বাসীর মত উপেক্ষা করিয়া ভারতস্থিত ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁহাদের সুবিধামত আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছেন, তখনই রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাইয়া বহু বার বহু ক্ষেত্রে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় সরকার যখন হস্তক্ষেপ করেন তখন প্রতিবাদস্বরূপ রামমোহন তাঁহার পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। এমন সাহস সেদিন একমাত্র তিনিই দেখাইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবাসীকে যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করা হউক, এই দাবীও তিনি উত্থাপন করেন।

দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। এক্ষেত্রেও তিনি বহু বার তাঁহার প্রতিভা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তিনি যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া সেদিন অনেক ইংরেজ রাজকর্মচারী পর্যন্ত রামমোহনের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এইভাবে বিচারশীল সত্যসন্ধতার ক্ষেত্রেই রামমোহন ভারতীয় চেতনাশ্রিত সমাজবিপ্লব-বাণী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ সার্থক হইতে পারিয়াছিল কেবলমাত্র এই কারণেই। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ও তাহার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও, ব্রাহ্মণ্যের সেই জীর্ণ খোলস রামমোহনের নিকটে দুঃসহ হইয়াছিল, অথচ ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান-সাধনার প্রতি কোনো দিনই শ্রদ্ধা হারান নাই। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁহার অঙ্গে উপবীত ছিল। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ এই রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার ব্যক্তিত্ব যেমন প্রবল, তেমনি প্রগাঢ় তাঁহার জীবনসত্য-বোধ। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা, ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবী, জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতিকতা, বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত ইসলামের একেশ্বরবাদ, বাইবেলের সহিত কোরান, কোরানের সহিত বেদান্ত। এই সমন্বয়ী দৃষ্টিই রামমোহনকে করিয়া তুলিয়াছিল জীবনশিল্পী—দার্শনিক, ভাবুক এবং কর্মবীর। গভীর হৃদয়ধর্ম, দীপ্ত মনীষা, সর্বসংস্কারমুক্ত মন এবং ক্ষুরধার লেখনী ইহাদেরই সমবায়ে গঠিত রামমোহন-মানস।

॥ তিন ॥

রামমোহনের মানস-জীবনের কথা আরো একটু বলা দরকার। তাঁহার জীবনপথ অনুসরণ করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার মনোজগতের ভিতর দিয়াই পথ করিয়া লইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষাকে বহন করিয়াই রামমোহনের আবির্ভাব"। কথাটি অতি সত্য। রাজার জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি বিশ্বাস করিতেন মানুষ দেবতা হইতে পারে। মানুষ অমৃতের সন্তান, উপনিষদের এই বাণী তিনি বিশ্বাস করিতেন। মানুষ যে মানুষ হিসাবেই দেবত্বের অধিকারী, অমৃতের সন্তান এই কথা প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য রামমোহন সর্বদা উৎসাহ বোধ করিতেন। মানুষ চিরস্বাধীন, এই বিশ্বাস এবং বোধ রামমোহনের সহজাত ছিল। ইহারই উপর তাঁহার সমগ্র চরিত্র দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের সেই অন্ধকারময় যুগে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, প্রকৃতিগতভাবে এবং স্বভাবত মানুষ চিরস্বাধীন। ব্যক্তির এই স্বাধীনতাকে না মানা ও স্বভাবধর্মকে অস্বীকার করা, তাঁহার নিকটে একই রকম অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। এই জীবনদর্শনই ছিল সেই যুগমানবের লোকহিতবাদের উৎস। আর এই জীবন-বেদ দ্বারাই অনুপ্রাণিত ছিল তাঁহার সমগ্র সত্তা। যে কোনো প্রকার বন্ধন, যাহা ব্যক্তির উন্মেষের পথে প্রতিবন্ধক—রামমোহনের নিকট অসহ্য ছিল। সেইজন্যই সেই দুঃসাহসী পুরুষ কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে, কি সমাজ-ব্যবস্থায়, অথবা মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান-বিকাশের ক্ষেত্রে—সর্বপ্রকার বন্ধন মোচন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

রামমোহন কেবলমাত্র শাস্ত্রালোচক দার্শনিক ছিলেন না বা কেবলমাত্র জ্ঞানী বা ধ্যানী ছিলেন না। নিজেকে তিনি নানা কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—শিক্ষা-প্রবর্তক হইয়াছিলেন, ধর্ম-প্রবর্তক হইয়াছিলেন, সমাজ-সংস্কারক হইয়াছিলেন। সমাজকে তিনি দেখিতেন একটি বাস্তব বিগ্রহরূপে, তাই ইহাকেও তিনি সর্বপ্রকার প্রথার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

সমাজে একটি কুপ্রথা অন্য কুপ্রথার সৃষ্টি করে এবং এইরূপে নব নব লৌহবলয় সংযোগে শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব এবং সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে সঙ্কুচিত করিবার নানারকম সামাজিক পীড়নের অস্ত্র নির্মিত হয়, এই কথা রামমোহনের পূর্বে আর কেহ এমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। তাই সর্বপ্রকার কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

রামমোহনের সংস্কার-প্রচেষ্টা ছিল বহুমুখী। সতীদাহ নিবারণ, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন, স্ত্রীলোকের দায়াধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ব্যক্তির জীবনে সর্বপ্রকার পরাধীনতা মোচন—এই রকম বিবিধ কর্মে ও আন্দোলনে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জমিদার বংশের সন্তান তো বটেই অধিকন্তু নিজেও তিনি বিত্তবান ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা থাকিলে রামমোহন সেই সময়ে কি না হইতে পারিতেন? কিন্তু সমষ্টিঃ কল্যাণের নিকট জীবনের ক্ষুদ্র সুখভোগ ও স্বার্থচিন্তা সব তুচ্ছ হইয়া গেল। রামমোহন সাধারণ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। কুপ্রথার নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়া তিনি দেশবাসীর করুণার উদ্রেক করিতেন না; অথবা তাহাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের নিকট আবেদন করিয়া কোনো প্রথার পরিবর্তন করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। উচ্ছ্বাসের তরল বালুবেলাভূমিতে তিনি কোনো দিনই তাঁহার হৃদয়ের অদম্য উৎসাহকে বিলীন হইতে দেন নাই। তিনি সর্বদাই কুপ্রথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া তাহার সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল রামমোহনের কর্মপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য। প্রখর যুক্তিপন্থী রামমোহন জানিতেন সত্যসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিবিহীন হৃদয়াবেগ সত্যলাভের প্রতিবন্ধক হইতে পারে। পরবর্তী সমাজ-সংস্কারকদের কর্মপদ্ধতির সহিত রামমোহনের কর্মপদ্ধতির পার্থক্য এইখানেই।

মানুষের মনের স্বাধীনতা-বিকাশই রামমোহনের একমাত্র কাম্য ছিল না। তাঁহার চিত্ত একটি বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। বিশ্বের সকল মানুষকেই তিনি একসূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন—যাহাতে মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে, যে সব কলহ-দ্বন্দ্ব আছে তাহা চিরকালের মত দূর হইতে পারে। ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাই তিনি হিন্দু,

মুসলমান ও খ্রীষ্টান সভ্যতার ধর্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাজনীতি, লোকবিধি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও বিধিবিধানের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও একটি 'অখণ্ড ঐক্যভূমি' আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অখণ্ড ঐক্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার প্রচারিত ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হইয়া মানুষে মানুষে প্রভেদ ও বিচ্ছেদ দূর করিবে—ভাবীকালের এমন কল্পচ্ছবি রামমোহনের নিকট প্রিয় ছিল।

রামমোহনের এই বিশ্বচারী মনের সন্ধান রাখিতেন কেশবচন্দ্র। তাঁহার অনন্যুকরণীয় ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন: "Who can look without wonder and profound reverence upon moral grandeur of that giant mind which conceived and realised a system of universal worship of the One True God....Heaven and earth met in this sublime conception, and time and eternity kiss each other." বস্তুত তাঁহার প্রচারিত সমাজের ট্রাস্ট-ডীডের মত এমন উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব আর কোনো দেশের কোনো ধর্মপ্রবর্তককে উদ্বোধিত করে নাই। রামমোহনের উপাস্য দেবতা—"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, ত্রাতা, অনাদি, অনন্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর'। ইহার উপাসক—"যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করিতে আসিবেন তিনিই—যে জাতি যে সম্প্রদায় যে ধর্মেরই লোক তিনি হোন না কেন?" এই সুমহান চিন্তার মধ্যে স্বর্গ মিলিয়াছে এই পৃথিবীর সহিত, আর ক্ষণকাল চুম্বন করিয়াছে শাশ্বত-কালকে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আর কোনো মানুষের মধ্যে এমন উচ্চ চিন্তার উদ্ভব হয় নাই।

বিশ্বমানবতা ছিল সেই মহান্ জীবনের আদর্শ; কারণ রামমোহন জানিতেন যে, বিশ্বাভিমুখী আত্মপ্রসারণের আদর্শ যদি জয়যুক্ত হয় তাহা হইলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হিসাবে দেশের মধ্যে সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তি সহজ ও স্বাভাবিক হইবে। রামমোহন রায়ের সাধনা ভারতবর্ষের চিত্তকে সত্যই এক নূতন আলোকের সন্ধান দিয়াছে। তাঁহার ছিল আত্ম-

প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিশুদ্ধ হৃদয়, ছিল পরিমার্জিত সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সূর্যদৃষ্টিদীপ্ত মন। দুই হাত দিয়া তিনি সূর্যালোক ছড়াইয়া গিয়াছেন। সংসারে সমাজে শিক্ষায় ও ধর্মে—জীবনের সকল বিষয়ে রামমোহন যে ভারতবর্ষের ধারণা ও স্থাপনা করিয়া গিয়াছিলেন, আজ শতাব্দীর অধিককাল পরেও দেখিতেছি, সেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও কর্মবীর হিসাবে তিনি একাই যেন দাঁড়াইয়া আছেন—কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় রামমোহনের জন্ম হয় নাই।

জাতীয় জীবনে সবলতা আনিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে সাধনা রামমোহন করিয়াছিলেন তাহার মোটামুটি চিত্রটি আমরা এইবার বুঝিবার চেষ্টা করিব। ইহারই মধ্যে তাঁহার জীবনের ইতিহাস লিখিত আছে। তাঁহার জীবনের কাহিনী বুঝিবার পক্ষে তাঁহার সাধনার পরিচয় গ্রহণ করা দরকার। যাঁহারা ইতিহাসের মানুষ, তাঁহাদের স্থূল জীবনী অপেক্ষা তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসই বেশী মূল্যবান। রামমোহনের জীবনচরিতকারগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার জীবনের কাহিনী যতটা বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ততটা করেন নাই। রামমোহন একটি ব্যক্তি-বিশেষ নহেন—তিনি ইতিহাসের একটি তরঙ্গ। সেই তরঙ্গের গতি ও প্রকৃতি অনুসরণ করিতে হইলে, তরঙ্গের রূপের প্রতি তাকাইলে চলিবে না—তাহার বিক্ষুব্ধ প্রবাহকে অনুসরণ করিতে হইবে। সেই কারণেই আমরা রামমোহনের স্থূল জীবনীর কথা পরে বলিব, আপাতত তাঁহার বিপুল ও বিচিত্র কর্মসাধনার ধারাকে অনুসরণ করিব।

ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন এক বৃহৎ সমন্বয়ের চেতনা। হিন্দুর যাহা শ্রেষ্ঠতম, মুসলমানের যাহা অন্তরতম, খ্রীষ্টানদের যাহা গভীরতম তাহার সহিত তিনি আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন। দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশেষ স্থানে আবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া প্রজ্ঞানেত্রে ধ্রুব চিরন্তন সার ও সত্যকে দর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্থান, কাল, সংস্কার, রুচি, আচার, অনুষ্ঠানাদির শত বিভিন্নতায় বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহের মিলনভূমি কোথায়, ইহা এক মহা-জিজ্ঞাসা। পৃথিবীর কোনো ধর্মপ্রবর্তকের মনে এই প্রশ্ন জাগে নাই। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের স্রষ্টা, ত্রাতা এক শক্তি আছে"—এই স্বীকারোক্তিতে, এই বিশ্বাসে এই

জিজ্ঞাসার সমাধান। রামমোহনের ধর্মসাধনার মূলেও একটি সুসঙ্গত জ্ঞানের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। তাই বিভিন্ন শাস্ত্ররাশি মন্থন করিয়া এই সমাধানে তিনি উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। অখণ্ড ঐক্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হইয়া মানুষে মানুষে প্রভেদ ও বিচ্ছেদ দূর করিবে—এই বিশ্বাস রামমোহন আজীবন পোষণ করিতেন।

রামমোহন চাহিয়াছিলেন মানুষের মনের মুক্তি—ধর্মে, অধ্যাত্মসাধনায় প্রাণহীন আচারপরায়ণতার পরিবর্তে স্বাধীন চিন্তা, মনন ও উপলব্ধি। আপ্তবাক্য নয়, প্রচলিত শাস্ত্রমতে অন্ধবিশ্বাস নয়, সত্যনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি এবং যুক্তি ও বিজ্ঞান অনুমোদিত পন্থা গ্রহণ—ইহাই ছিল রামমোহনের নির্দেশ। জীবনের বিকাশের জন্য, সমাজের বিকাশের জন্য নূতনের প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু রামমোহন বলিলেন, ঐতিহ্য-সচেতনতা ও প্রাচীন জাতীয়-বিকাশের প্রণালীর ভিতর দিয়াই নূতনকে আহ্বান করিতে হইবে।

জনসাধারণের মুক্তি ভিন্ন সমাজের উন্নতি নাই, অগ্রগতিও নাই। রামমোহন তাই দাবী করিলেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বপ্রকার প্রভুত্ব হইতে জনসাধারণের মুক্তি এবং সমাজে ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান ও রাষ্ট্রে সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা লাভের সাধনা। সাম্যবাদ ও লোকশ্রেয়ঃ-বাদ, ইহাও রাজার কর্মসূচীর অন্তর্গত। রামমোহনের ভিতরে জ্ঞান ও কর্ম, ধ্যান ও জাতীয় মঙ্গল সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। রামমোহন জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা। গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাহা কিছু প্রয়োজন—ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি—সব লইয়া এক পূর্ণাঙ্গ সাধনার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছিলেন।

জাতীয়তা, বিশ্বমানবতা ও অক্ষুণ্ণ মানবপ্রীতি—এই ত্রিবেণীধারায় প্রবাহিত হইত রামমোহনের মন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন সত্য, কিন্তু সেইখানেই তাঁহার মন বাঁধা পড়ে নাই। প্রত্যেক জাতির উন্নতি অবনতি অভ্যুত্থান ও পতনের সহিত যেন তাঁহার হৃদয়ের তার বাঁধা ছিল; তাহার ভিতর দিয়া

তরঙ্গায়িত হইয়া কখনো জয়ের কখনো বা পরাজয়ের সমাচার সেই নিখিল মানব-প্রেমিককে পুলকিত বা বিষণ্ণ করিত। এই অক্ষুণ্ণ মানব-প্রীতি ছিল বলিয়াই রামমোহনের সচেতন সজাগ হৃদয়ে স্বদেশের জন্য একটি বড় স্থান ছিল। এই জন্যই স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশা ; অভাব-অভিযোগ তাঁহার প্রাণকে আকুল করিত। যাহারা স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন, অসীম মানবত্বের সহিত যাঁহাদের হৃদয়ের যোগ নাই, তাঁহারা যে স্বদেশের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, ইতিহাস এ-কথার সাক্ষ্য দেয় না। এইখানে রামমোহন একেশ্বর সূর্য। স্বজাতির মুক্তির পথ যেমন তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, মানবজাতির মুক্তির পথও তেমন নির্দেশ করিয়াছেন। রামমোহনের প্রতিভা তাই কেবলমাত্র সর্বতোমুখী নয়, সার্বভৌমিকও বটে। ইতিহাসের শিখর-দেশে রাজার চিন্তা-ভাবনা আজো তাই স্থির ও স্নিগ্ধ প্রভায় দীপ্যমান।

রামমোহন যুগ-সারথি।

যুগের জন্য যাহা প্রয়োজন সেই সব কর্মে তিনি আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বত্রই আনিয়াছিলেন যুক্তি ও বিচার, একটি প্রোজ্জ্বল মানসিক আলো। কোনো ভাবালুতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। মনন ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণ লইয়া তিনি সমস্ত সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার যাবতীয় রচনায় ও বক্তব্যে এই বিচারপরায়ণতা, ভাবসাম্য ও শান্ত স্থৈর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এইসব কারণেই রামমোহন সমাজের জড়জীবনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন, জাতীয় জীবনে এক অখণ্ড ঐক্য ও আত্মপ্রসারণের ভিত্তি স্থাপন ও অভূতপূর্ব সফলতার সম্ভাবনার পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধনার মন্ত্র ও তাঁহার অন্তহীন দান সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারিলে আমরা সুমহৎ কল্যাণ ও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

মনুষ্যত্বের ও মুক্তিসাধনার মূর্ত বিগ্রহ রামমোহন।

শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা, লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধির আদর্শ—

নব্যভারতের অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ। উপশাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রামমোহন মানুষকে দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন সকল ধর্মের মূল শাস্ত্রের উপরে। পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুকে তিনি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন বেদ-উপনিষৎ, ফকির বা মোল্লাদের ইসলাম-ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া মুসলমানকে অবলম্বন কবিতে বলিয়াছেন মূল কোরান, আর পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত ত্রিত্ববাদ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া খ্রীষ্টানকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন মূল বাইবেল। অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক ঋষির ন্যায় জটাবল্কলও পরিধান করেন নাই, ফলমূল খাইয়া জীবন অতিবাহিত করিবার প্রয়োজনও তেমন অনুভব করেন নাই। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষভাবে অনুশীলন করিতে বলিয়াছেন আধুনিকতম বিজ্ঞান। তাঁহার এই মনোভাবের অর্থ মিলিবে তাঁহার এই বিখ্যাত উক্তিটির ভিতরে—"ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের ?"

সমস্ত রকমের সত্যানুসন্ধান, সমস্ত শুভ চেষ্টা যে আমাদের জীবনে ভগবানের উৎসব, সমর্পিতপ্রাণ, মহাকর্মী ও মানবগুরু রামমোহন তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই পৃথিবীর যে-দেশে মানুষ অন্তহীন প্রয়াসে নিজেদের জীবনে ভগবানের উৎসব-আয়োজন করিয়াছে, সেখানেই রাজা সশ্রদ্ধ নেত্রপাত করিয়াছেন। আর যেখানে তাহার বিপরীত জিনিস দেখিয়াছেন, সেখান হইতে তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছেন। রামমোহনের এই যে চিরজাগ্রত ভগবানকে মানুষের অন্তহীন শুভ প্রয়াসের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিবার সাধনা—ইহাই তাঁহার জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। উনবিংশ শতকে ভারত এক নব-সমন্বয় কামনা করিয়াছে। নব-মানবতার উদ্বোধন, মানবজীবনের নব সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস, ভারতের সত্যকার কল্যাণের জন্য প্রয়োজন। রামমোহনের মুক্তিমন্ত্রে, সর্বজনীন চিন্তাধারা ও বিরাট জ্ঞান-সমন্বয়ে সেই নব সমন্বয়ের অক্ষয় ভিত্তিপত্তন হইয়াছে। রাজার জীবনব্যাপী পথ পরিক্রমা ব্যর্থ হয় নাই, আকাঙ্ক্ষিত অগ্রগমনের পথে তাঁহার পদক্ষেপ নিশ্চিত হইয়াছে—জাতির জীবনে তাহার ফলও সার্থক হইয়াছে। আজিকার ইতিহাসে সেই মানবগুরুর জন্য নূতন আসন রচিত হইবে।

॥ চার ॥

রামমোহন তাঁহার আত্মপরিচয় এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন :

"আমার পূর্বপুরুষেরা উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম সম্বন্ধীয় কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজ-সভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থার বৈপরীত্য হইয়া আসিয়াছে; কখন সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখন বা পতন; কখন ধনী, কখন নির্ধন; কখন সফলতালাভে উৎফুল্ল, কখন বা হতাশ্বাসে কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিক ধর্মানুসারে ধর্মযাজকব্যবসায়ী এবং উক্ত ব্যবসায়িগণের মধ্যে তাঁহাদিগের পরিবারের ন্যায় উচ্চতর পদবীস্থ আর কেহই ছিলেন না। তাঁহারা বর্তমান সময় পর্যন্ত সমভাবে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মচিন্তাতে অনুরক্ত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।

"আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। মুসলমান রাজসরকারে কার্য করিতে হইলে উক্ত দুই ভাষার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই; হিন্দু সাহিত্য, ব্যবস্থা ও ধর্মশাস্ত্র সকলই উক্ত ভাষায় লিখিত।

"ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর

উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশত আমি ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে আমার পিতা আমাকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন, আমি পুনর্বার তাঁহার স্নেহ লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইয়োরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণত অধিকতর বুদ্ধিমান্, অধিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন বিদেশীয় শাসন হইলেও, উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমি তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাসভাজন ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর প্রথা নিবারণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে, আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; এবং তাঁহাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্বার বিমুখ হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পথ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মত সকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, দুই-তিনজন স্কটল্যাণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতির অন্তর্গত তাঁহাদিগের প্রতি আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ।

"আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই।

উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও তদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্ত্বেও, আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

'এই সময়ে ইয়োরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা হইল। যাহা হউক, যে পর্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দলবল বৃদ্ধি হয়, সে পর্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কৌন্সিলে আপিল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে, ইংলণ্ডের রাজকর্মচারীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য, তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন। আমি তদনুসারে ১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসে, ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হই।"*

রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ত আত্মচরিতের সূত্র অবলম্বন করিয়াই তাঁহার

---

* ব্রিষ্টলে রামমোহনের রোগশয্যাপার্শ্বে যাঁহারা সর্বদা থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কুমারী কার্পেণ্টার অন্যতমা। ইংলণ্ডে রাজার জীবনের শেষ দিনগুলির ইতিহাসও ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুমান এই যে, রামমোহন রায় ইংলণ্ড হইতে ফরাসীদেশে যাইবার অব্যবহিতপূর্বে আত্মচরিতমূলক এই পত্রখানি তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধু গর্ডন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর এক সপ্তাহকাল পরে মিষ্টার স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট কর্তৃক ইহা 'অ্যাথেনিয়ম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইখানে যে অনুবাদ দেওয়া হইল, উহা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ। এই পত্রের তারিখ এপ্রিল, ১৮৩৩।

কর্মবহুল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহার বহুমুখী চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা কতকটা সহজ হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, রামমোহনের কোনো কোনো আধুনিক চরিতকার এই পত্রখানির প্রামাণ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহনের চিন্তাধারা যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন যে এইরূপ সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশ নাই। পত্রের লিখনভঙ্গী হইতেও ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ইহা অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে না; ইহার প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি বাক্যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে রামমোহন-মানসই প্রতিফলিত হইয়াছে। তা'ছাড়া রাজার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, কুমারী মেরী কার্পেণ্টার তাঁহাদের মধ্যে একজন এবং তাঁহার অনুমান অনুমানমাত্র হইলে তিনি তাঁহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিতেন না। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই গর্ডন সাহেব কি জন্য রামমোহনের নিকট হইতে তাঁহার আত্মপরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং কেনই বা রামমোহন ইহা লিখিলেন? পত্রখানি স্পষ্টত গর্ডন সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা; কারণ পত্রের প্রথমেই উল্লিখিত আছে যে, "আপনি জানিতে চাহিয়াছেন" ইত্যাদি এবং ইহা কলিকাতার তৎকালীন কোনো ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে রামমোহন পত্রে সূত্রাকারে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তিনি আরো বিশদভাবে বিবৃত করিতেন। কলিকাতার বহু কারবারী ইংরেজের সহিত রামমোহন ব্যবসায়-সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, সম্ভবত এই গর্ডন সাহেব ঐরূপ একজন ইংরেজ। রামমোহনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তখন কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত। সম্ভবত গর্ডন সাহেব কৌতূহলবশত রামমোহনের জীবনের কথা জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়া থাকিবেন এবং রামমোহন তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্য বশত উহার উত্তর দিয়া থাকিবেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বীয় জীবনের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া রামমোহন সহজ ও সরলভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই, বৃথা বাগ্‌জাল-বিস্তার নাই, বাহুল্য নাই। পারিবারিক পটভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ জীবনের আদর্শের কথা অত্যন্ত সংযমের সহিত এবং অকপটভাবে তিনি বর্ণনা

করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত আত্মকথার স্বচ্ছ দর্পণে রামমোহন-মানস চমৎকার ভাবেই কি প্রতিফলিত হয় নাই ?

রামমোহনের পূর্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদ জেলার সাঁকাসা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে নবাব সরকারের কার্য করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রকে 'রায় রায়ান্' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তখন হইতেই 'রায়' পদবী তাঁহাদের পরিবারে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের তসিলদার ছিলেন। খাজনা আদায়ের কার্যে তাঁহাকে মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগরে আসিতে হইত। ইহা তখন বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কথিত আছে, এইস্থানে জনৈক সাধু পুরুষের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার সহিত ধর্মবিষয়ের আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হন। ক্রমে সাধুর প্রতি আকর্ষণ এই স্থানটির প্রতিও কৃষ্ণচন্দ্রের মনে আকর্ষণ জাগাইয়া তুলিল। অবশেষে তিনি বাস্তভূমি সাঁকাসা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে এইখানে আসিলেন। কৃষ্ণনগরের নিকটেই রাধানগর। স্থানটি কৃষ্ণচন্দ্রের ভাল লাগিল। অতঃপর রাধানগরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিলেন। নূতন বাড়িতে নূতন বিগ্রহ গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, বন্দ্যোপাধ্যায়েরা বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ছিলেন। রামকান্ত পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ন ছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র অতি গুণবান ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যেমন প্রখর তাঁহার বুদ্ধি তেমনি কার্যদক্ষতা, নবাব সরকারে তাঁহার সুনামও তেমনি। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—হরিপ্রসাদ, অমরচন্দ্র ও ব্রজবিনোদ। ব্রজবিনোদ সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন এবং দেশহিতৈষণা ও ধর্মানুরাগের জন্যও তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ব্রজবিনোদের সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা এবং ব্রজবিনোদ তাঁহারই অধীনে কার্য করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নবাব সরকারের চাকরি তাঁহাদের বংশানুক্রমিক। কিন্তু তিনি বেশি দিন চাকরি করেন নাই। নবাব সরকারের সদ্ব্যবহারের অভাবই নাকি তাঁহার চাকরি ত্যাগের কারণ।

ব্রজবিনোদের সাত পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত। রামকান্ত রায়ও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকরি লইয়াছিলেন এবং পিতার ন্যায় পুত্রও একই কারণে বিরক্ত হইয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। এই রামকান্তই রাজা রামমোহন রায়ের পিতা ছিলেন। চাকরি ছাড়িয়া দিয়া রামকান্ত বর্ধমানরাজের নিকট হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। রাধানগরের রায়েরা সেই দিন হইতে জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং এই জমিদারীই উত্তরকালে তাঁহাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণস্বরূপ হইয়াছিল।

রামকান্তের তিন বিবাহ। দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিণীদেবীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্যাই সর্বজ্যেষ্ঠা; দ্বিতীয় ও তৃতীয়, পুত্রসন্তান। প্রথম পুত্রের নাম জগন্মোহন (সাধারণত ইনি জগমোহন নামে পরিচিত ছিলেন), আর দ্বিতীয় পুত্রের নাম রামমোহন। রামকান্তের প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তৃতীয়া পত্নী রামমণির গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম রামলোচন। গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তারিণীদেবী। তারিণীদেবীর পিতৃকুল পরম শাক্ত। বৈষ্ণবের ঘরে কেমন করিয়া শাক্তের মেয়ে আসিল, তাহা আমাদের জানিবার দরকার নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়কার বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের ইতিহাস খুঁজিলে বিবাহসূত্রে এইরূপ শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলনের অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাইবে। রায়-পরিবারে তারিণীদেবীর ডাক নাম ছিল 'ফুলঠাকুরাণী'। রামমোহনের প্রায় সকল চরিতকারই তারিণীদেবীকে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্মপরায়ণা নারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামমোহনের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তাঁহার মায়ের সম্পর্কে এই উক্তি যথার্থ। তাঁহার মায়ের এই প্রত্যেকটি গুণই, এমন কি দেহসৌষ্ঠব পর্যন্ত রামমোহন উত্তরাধিকারসূত্রে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছিলেন। মায়ের তেজ ও ধর্মপরায়ণতা এবং পুত্রের তেজ ও ধর্মপরায়ণতা এমনই প্রবল ছিল যে, ইহাই পরবর্তীকালে মাতা ও পুত্রের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। বৈষ্ণব পরিবারের বধূ হইলেও শাক্তবংশেরই রক্ত ফুলঠাকুরাণীর শরীরে প্রবল ছিল।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের প্রপৌত্রী হেমলতা দেবী এই তারিণী দেবী সম্পর্কে লিখিয়াছেন : "মহাতেজস্বিনী রামমোহন-জননী সাধারণ নারী ছিলেন না। বিষয়বুদ্ধি ছিল তাঁর এতই প্রখর যে স্বামী জমিদারীর কাজ চালাতেন তাঁর পরামর্শ নিয়ে। বৈধব্যে তিনি স্বয়ং জমিদারী পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। জমিদার-সংসারের কর্মচারীরা সময়ে সময়ে তাঁর আইন-সংক্রান্ত কূট প্রশ্নে বিস্মিত ও চমৎকৃত হতো, শোনা যায়। একনিষ্ঠ দেবভক্তি তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, দেবতার নামে প্রাণসম-পুত্র রামমোহনকে বিধর্মী-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছিলেন। মায়ে-ছেলেতে এ নিয়ে গোল বেধেছিল কম নয়। দেশে গিয়ে রাজা একদিন মাকে প্রণাম করতে গেলেন পদধূলি নিয়ে। মা বললেন, 'যে-সন্তান আমার ঠাকুরকে প্রণাম না করে, আমি তার প্রণাম গ্রহণ করি না'। রাজা মাকে প্রণাম না করে ফিরবেন না। ফলে তিনি রাধাগোবিন্দ বিগ্রহের সামনে মাথা নামিয়ে বললেন, 'মায়ের ঠাকুর, তোমাকে প্রণাম করি'; তবে তিনি মায়ের পায়ের ধুলো নিতে পেরেছিলেন।"

সুতরাং এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, উত্তরাধিকারসূত্রে রামমোহন তাঁহার গর্ভধারিণী মায়ের প্রখর ব্যক্তিত্বের সম্পদ অনেকখানিই লাভ করিয়াছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, বাল্যজীবনে পিতামাতার কিছু প্রভাব থাকিলেও উত্তরকালে রামমোহনের জীবনে ইঁহাদের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না।

এই রামকান্ত রায়ের ঔরসে ও তারিণীদেবীর গর্ভে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মে রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। সুতরাং রামমোহনের জন্মকাল পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগ নহে, আধুনিক যুগেই তাঁহার জন্ম বলা যাইতে পারে। রামমোহনের জন্ম এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ—একই বৎসরের ঘটনা। রামমোহনের জীবনচরিত আলোচনা-প্রসঙ্গে এই তথ্যটি আমাদের মনে রাখা দরকার।

রামমোহনের জন্মকাল বাংলার ইতিহাসে একটি অন্ধকার যুগ। চারিদিকেই অজ্ঞানতা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের রাজত্ব। শাস্ত্র নহে, উপশাস্ত্রেরই

প্রাধান্য। বেদ ও উপনিষদের মধ্যে যে কি অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহাই অনেকে জানিতেন না। পুরাণ ও পুরোহিততন্ত্র-শাসিত সেই কালরাত্রির যুগে ধর্ম সম্বন্ধে লোকের কি শোচনীয় অজ্ঞতাই না ছিল! জ্ঞানের লেশমাত্র কোথাও নাই, লোকের মন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভাষা নাই, সাহিত্য নাই, বর্ণজ্ঞান নাই—দিনযাপনের গ্লানি স্বীকার করিয়া বাঙালি কোনোমতে অস্তিত্বের ভার বহন করিত মাত্র।

সমাজের অবস্থা আরো শোচনীয়।

গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ, মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমরণ—এই রকম জ্ঞানবিহীন ধর্মানুরাগের ভিতর দিয়া চলিয়া সমাজ যেন শতাব্দীর শেষ পাদে পৌঁছিয়া আপনার চিতাশয্যা রচনা করিল। তখনকার বাংলার সামাজিক অবস্থা, রামমোহনের অন্যতম উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। অন্নের বিচারই ধর্মের পরাকাষ্ঠা ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরই বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজ-দিগের অধীনে বিষয়কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন।...তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামাজিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাল। বঙ্গভূমি তিমিরাবৃত অরণ্য-ভূমি রাক্ষসভূমি ছিল। ভ্রষ্টাচারের পিশাচসকল তাহাতে রাজত্ব করিত।"

রামমোহনের জন্মের পটভূমি এইখানেই সম্পূর্ণ নয়। মনে রাখিতে হইবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দুই বৎসর পরে তাঁহার জন্ম; সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি তখন চরমে উঠিয়াছিল বলিলেই হয়। বাংলার শাসন-ব্যবস্থায়ও তখন একটি গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। রামমোহনের জন্মের বৎসরে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ক্লাইবের দ্বৈত শাসন রদ করিয়া প্রকাশ্যভাবে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজকোষ তুলিয়া আনিলেন, রাজস্বের

তত্ত্বাবধানের জন্ত বোর্ড অব রেভিন্যু স্থাপিত হইল এবং তখন হইতে কলিকাতা বাংলার রাজধানী হইল। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের জন্মের বৎসর নবাবী আমলের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিল। অতএব তিনি পুরাদস্তুর ইংরেজ আমলেই মানুষ। নূতন যুগের নূতন মানুষ।

বাংলাদেশের এই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। জন্মগ্রহণ বলিব না, বলিব—"তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়"। রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করিয়াই এই দেশে রামমোহনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যুগোচিত পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণের প্রভাব এই যুগে প্রত্যক্ষ। এই প্রভাব-ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবাত্মক মনোভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছিল। যে মনীষা ও অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে যুগ-চিহ্নিত লক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা যায় তাহা আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। রামমোহন ইঁহাদেরও পূর্ববর্তী। বস্তুত সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় একজন শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব যেন ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই দেখা দিয়াছিল।

॥ পাঁচ ॥

রামমোহন লিখিয়াছেন: "আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম"। শুধু পিতৃবংশের নহে, ইহাই তখনকার প্রথা ছিল। কারণ তখনো দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। একটি যুগের অন্তে অপর একটি যুগ আসিয়া গিয়াছে, কিন্তু পুরাতন যুগের ভাষা রহিয়া গিয়াছিল। আইন-আদালতের কার্য এই ভাষাতেই হইত। বাংলা ভাষার পঠন-পাঠন তখন বিশেষ ছিল না—বাংলা ভাষাই তখনো পর্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ রূপ ও অবয়ব লইয়া দেখা দেয় নাই। নবাবী আমলের ভাষা ছিল পারস্য বা ফার্সী। ইহাই ছিল রাজদরবারের প্রচলিত ভাষা। ভদ্রবংশীয় বাঙালিমাত্রেই এই ভাষা শিক্ষা করিতেন। আমরা রামমোহনের জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, বাড়িতেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলবীর নিকটই তিনি পারস্য ও আরব্য ভাষাও শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া শিক্ষক চমৎকৃত হইতেন। রামকান্ত ঘোর বৈষয়িক ছিলেন; পুত্রকেও বিষয়বুদ্ধিতে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রামকান্ত রামমোহনকে তখনকার সরকারী ভাষা আরবী-ফার্সী শিক্ষা দেন। পিতার ইচ্ছা রামমোহনের মধ্যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধিতে রামমোহন আজীবন আর্থিক সমৃদ্ধি ধাপে ধাপে বাড়াইয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে জ্ঞানের সম্পদও।

রামমোহনের বাল্যকালের দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। একটি তাঁহার মেধাশক্তি, অপরটি গৃহবিগ্রহ গোপীনাথের প্রতি ভক্তি। প্রথমটির পরিণতি কি চমৎকারভাবে তাঁহার পরবর্তী জীবনে ঘটিয়াছিল, ইহা আমরা সকলেই জানি; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। বিগ্রহে ভক্তি তাঁহাকে বিগ্রহের প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্যে রামমোহনের ধর্মশিক্ষা তাঁহার মায়ের নিকটেই হইয়াছিল। হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত, ধর্মের নানা অলৌকিক কাহিনী, পুরাণের রোমাঞ্চকর কত উপাখ্যান—এ-সবই কল্পনাপ্রবণ

বালক মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহার মনও ভরিয়া উঠিয়াছে। ধর্মে অগাধ নিষ্ঠা, গৃহদেবতায় অগাধ ভক্তি—বালক রামমোহনের এই ভাব দেখিয়া রামকান্ত ও তারিণীদেবী উভয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বৈষ্ণব বংশের পুত্র তাহা হইলে বংশের ধারা বজায় রাখিবে, তুলসীতলায় বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতে করিতে কতদিন রামকান্ত ইহা ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ভাবিতেন, পিতৃসত্য পালনের জন্যই না তিনি নিজে বৈষ্ণব বংশের পুত্র হইয়া শাক্ত বংশের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সত্যপালনেরই পুণ্য ফল কি রামমোহনের মতো এমন ধর্মনিষ্ঠ, মেধাবী বালক? এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাহাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সেরূপ কামনা থাকা স্বাভাবিক। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে তিনি পুত্রকে পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তখন রামমোহনের বয়স নয় বৎসর। রামকান্ত মনে করিতেন, রামমোহন ভাল করিয়া আরবী ও ফার্সী শিখিলে নবাব সরকারে তাহার একটি ভাল চাকরি সুনিশ্চিত। কোম্পানির সরকারে চাকরি গ্রহণ তখনো পর্যন্ত বাঙালির চিন্তায় আসে নাই। নবাবী আমল যে শেষ হইয়া গিয়া নূতন কোম্পানি-আমল আরম্ভ হইয়াছে, তখনকার দিনের বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালিই যেন ইহা চিন্তা করিতে পারিতেন না। যুগ-পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লওয়া বা অনুভব করা কিছু কঠিন।

রামমোহন পাটনায় আসিলেন। এইখানে কিশোর রামমোহনের অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয়। দুই-তিন বৎসরের অধিককাল তিনি পাটনায় ছিলেন না। কিন্তু এই স্বল্পকালের অবস্থিতির প্রভাব তাঁহার জীবনের উপর অত্যন্ত গভীর; এই প্রভাবের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে রামমোহনের কর্ম ও চিন্তাধারা অনুসরণ করা সহজ হইবে। রামমোহন মেধাবী ছিলেন। দুই-তিন বৎসরেই তিনি ফার্সী ও আরবী ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। সাধারণভাবে শিখিয়া ফেলা নহে, একেবারে মাতৃভাষার মতন তিনি আয়ত্ত করিলেন এই দুইটি ভাষা। মূল আরবীতে এরিস্টটল ও ইউক্লিডের গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক প্রখর বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর ও মার্জিত হইল। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিল। পরবর্তীকালে তিনি যে একজন বীর তর্কযোদ্ধারূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পিছনে ছিল এই এরিস্টটল ও ইউক্লিড।

পাটনায় শিক্ষাকালে রামমোহন ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরান অধ্যয়ন করিলেন, সেই সঙ্গে স্থফীদিগের গ্রন্থও। রামমোহনের চিন্তাজগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া আসে। হাফিজ ও রুমি রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোরান হইতে রামমোহন অনেক কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোরানের বহু বাণী তাঁহার মর্ম স্পর্শ করিয়াছিল। নারীজাতির পক্ষ রামমোহন আজীবন সমর্থন করিয়াছেন। ইহার প্রথম পাঠ তিনি কোরান হইতেই পাইয়াছিলেন। নারীর প্রতি স্থবিচার ও সদয় ব্যবহার করিবার উপদেশ কোরানে বিস্তৃতভাবে আছে। কিন্তু কোরান হইতে সবচেয়ে বড়ো জিনিস যাহা রামমোহন লাভ করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা। তাঁহার যে সব ব্রহ্মসঙ্গীতে ঈশ্বরের মহিমা অতি স্থন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কোরানের অনেকগুলি বচনের প্রতিধ্বনি যেন আমরা শুনিতে পাই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় বলিবার আছে। মানুষের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে সব মুসলমান কোরান বুঝিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মোতাজেল সম্প্রদায় স্থবিখ্যাত। মানুষের অন্তরের অনুভূতি বিশেষভাবে তাহার সত্যোপলব্ধির সহায়ক। এই মত যে সব মুসলমান পোষণ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে স্থফী সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা স্থবিখ্যাত। রামমোহনের চক্ষে যে ইস্‌লাম মহিমা বিস্তার করিয়াছিল তাহা মোতাজেল ও স্থফীদের উপলব্ধ ইস্‌লাম। ইস্‌লামের পরিচিত রূপের প্রতি রামমোহন কোনো দিনই আকৃষ্ট হন নাই, যেমন হন নাই তিনি হিন্দুধর্মের বা খ্রীষ্টধর্মের প্রচলিত রূপের প্রতি। সাদী, হাফিজ প্রমুখ স্থফী সহিত্যিকদের রচনাও তাঁহার চিত্তের সন্তোষ সাধন করিয়াছিল। সাদীর একটি বাণী রাজার খুব প্রিয় ছিল: "জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়; তসবির (পট বা চিত্র] জায়নামান (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম নাই"।

কথিত আছে, রামমোহন মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, এই বচনটি যেন তাঁহার সমাধিগাত্রে উৎকীর্ণ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের কৃষকদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহাদের দুঃখ

দূর করিবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষদের রামমোহন যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, সেই অনুরোধ-লিপির উপসংহারে তিনি সাদীর এই বাণীটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন : "প্রজাদের সহিত প্রীতিবদ্ধ হও ও (এইভাবে) তোমার শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও ; কেননা ন্যায়পরায়ণ নরপতির সৈন্য হইতেছে তাহার প্রাণ"।

সুফীদের সুগভীর মানবপ্রেমের ভিতর দিয়াই রামমোহনের চিত্ত সুস্পষ্ট-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন যে পরবর্তী জীবনে সুস্পষ্টভাবে করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল সুফীদের মানবপ্রেম বা জীবপ্রেম। আর তাঁহার অন্তর ও বাহির উভয়কে বীর্যবন্ত করিয়াছিল মোতজেল-বাদ। তাঁহার প্রখর যুক্তিবাদী মনের গঠনে ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান। এমন কি, তাঁহার যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান সায়ক গৃহীত হইয়াছিল মোতাজেলা তূণ হইতে। তবে মোতাজেলদের সহিত রামমোহনের পার্থক্যও বড়ো কম ছিল না। মোতাজেলরা সাধারণত বিচারপন্থী পণ্ডিত, রামমোহনের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ। তিনিও বিচারপন্থী পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু আসলে রামমোহন ছিলেন বিচারপন্থী কর্মী—স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুসলিম সাধনাকে রামমোহন যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন বা যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ স্তরের নহে। ইহারই ফলে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে মুসলমান-সম্প্রীতি খুব প্রবল ছিল। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়ের লোক রামমোহনের উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন। রামমোহন যে ভাবে মুসলিম সাধনাকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা একমাত্র তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান যুগমানবের পক্ষেই সম্ভব।

পাটনায় আরবী ও ফার্সী পড়া শেষ হইল।

লোকপরম্পরায় রামকান্ত শুনিতে পাইলেন রামমোহন ইসলামধর্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব রামকান্তের মনে পড়িল শ্যাম ভট্টাচার্যের অভিশাপের কথা। শ্যাম ভট্টাচার্য তারিণী দেবীর পিতা। "কালে

এই পুত্র বিধর্মী হইবে"—পিতার এই অভিশাপ তারিণী দেবীকে যেমন বিচলিত করিয়াছিল, তেমনি উদ্বিগ্ন করিয়াছিল রামকান্তকে। তাই এইবার তিনি পুত্রকে হিন্দুধর্মের মর্মজ্ঞ করিতে চাহিলেন। ইহা করিতে হইলে রামমোহনকে সংস্কৃত শিখাইতে হয়। কাশী ভিন্ন সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত স্থানই বা কোথায়? অতএব রামকান্ত পুত্রকে কাশী পাঠাইলেন। রামমোহনের বয়স তখন বার বৎসর মাত্র। রামমোহন লিখিয়াছেন: "আমার মাতামহ-বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্ত হই"। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, হয়ত বা কোনো এক সময়ে তাঁহার মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য তাঁহার কন্যা অথবা জামাতাকে পরামর্শ দিয়া থাকিবেন যে, রামমোহনকে যেন সংস্কৃত শিক্ষা অতি অবশ্য দেওয়া হয়। হয়ত বা মাতামহ তাঁহার অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া থাকিবেন। হিন্দুশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হইতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেই হইবে। কারণ হিন্দুর যাবতীয় শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তাঁহার জীবনচরিতকারগণ লিখিয়াছেন যে, কাশীতে আসিয়া রামমোহন অল্পকালের মধ্যে প্রধান প্রধান আর্যশাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান উপার্জন করেন। মুসলিম সাধনার সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছেন। এইবার রামমোহন হিন্দুসাধনার সহিত পরিচিত হইলেন। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ ও বেদান্তের ব্রহ্ম—এই দুইটির মধ্যে রামমোহন কোনো পার্থক্য দেখিতে পাইলেন না। রামমোহনের ধর্মজগতে বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হইল। প্রচলিত সংস্কারের ভিত্তিভূমি শুধু শিথিল হইল না, উহা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। কাশী হইতে রামমোহন যখন রাধানগরে ফিরিলেন, তখন হইতেই তিনি এক স্বতন্ত্র রামমোহন—পুরাদস্তুর iconoclast বা মূর্তিবিরোধী রামমোহন। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি রামকান্ত রায়ের পুত্র, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তখন হইতেই তিনি যুগমানব বলিয়া চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন। ধর্মসম্বন্ধে পুত্রকে ভিন্ন মত পোষণ করিতে দেখিয়া রামকান্ত যারপরনাই দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। হইবারই কথা; এত আশা, সবই নিষ্ফল হইল। এত অর্থব্যয় বৃথা হইল।

এমন সময়ে রামমোহন এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। হিন্দুধর্মকে একটু মৃদু আঘাত করিলেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিলেন। বইখানির নাম 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী'। ইহা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বাংলা ভাষা তখনও পর্যন্ত ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় নাই। যদি মুদ্রাযন্ত্রের স্থবিধা থাকিত, রামমোহন হয়ত উহা ছাপাইয়া দেশময় বিলি করিতেন। রায়-পরিবারে যেন একটি ছোটখাটো ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। যোল বৎসরের ছেলের এই কাণ্ড! কে তাহার মাথায় এই দুর্বুদ্ধি দিল? হিন্দু হইয়া, বৈষ্ণববংশের পুত্র হইয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বই লেখা? এ দুঃসাহস বালক কোথা হইতে পাইল? গৃহের চারি দেয়ালের মধ্যে এত বড়ো সংবাদ আর চাপা রহিল না। কথাটা শীঘ্রই জানাজানি হইয়া গেল। রাধানগরের শান্ত পরিবেশ সহসা যেন সচকিত হইয়া উঠিল। উদ্যতদণ্ড সমাজদেবতার রক্তচক্ষু রামকান্তকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তিনি পুত্রকে ডাকাইয়া প্রথমে মিষ্ট কথায় বুঝাইলেন। পরে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "আমার গৃহে বিধর্মীর স্থান নাই"। অন্দরমহল হইতে তারিণী দেবী ছুটিয়া আসিলেন, বলিলেন, "আমি মনে করিব আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি তোমার মতো কুপুত্রকে লইয়া ঘর করিতে পারিব না।"

পিতা-পুত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল।

পুত্র ও মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ হইল।

হিন্দু সমাজের সহিত বিচ্ছেদ হইল।

রামমোহন গৃহত্যাগ করিলেন।

রামমোহনের জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। যোল বৎসর বয়সের সময়ে এই ঘটনাটি দ্বারা তাঁহার সমগ্র জীবনের গতি একপ্রকার নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সেই স্মরণীয় মুহূর্তে এই আজন্মবিদ্রোহী হয়ত মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন—আমি হিন্দুধর্মের সংস্কার করিব। পুতুল পূজার গ্লানি হইতে আর্যধর্মের চিরন্তন মহিমাকে রক্ষা করিব। পুরোহিতের বিধান হইতে মানুষের ধর্মচিন্তাকে অবিকৃত রাখিব। এই ঘটনাটিকেই আমরা রামমোহনের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলিতে চাই।

বলিয়াছি, রামমোহনের গৃহত্যাগ-ঘটনাটি অনুধাবনযোগ্য। রামমোহন-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তা—সে দৃঢ়তা আত্মপ্রত্যয়ে স্থির, সংকল্পে কঠোর, স্নেহভালবাসা ও হৃদয়াবেগের ঊর্ধ্বে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় অবিচলিত। তাঁহার এই দৃঢ়তার জন্য অনেকে তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছে, অনেকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার এই দৃঢ়তার মূলে রেনেসাঁর যে প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল তাহা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। রামমোহনের এই দৃঢ়তাই বহু যুগের পরপদানততায় দুর্গত, নিশ্চেষ্ট বাঙালির নির্জীব প্রাণে জাগরণ আনিয়া দিয়াছিল। আরো পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, বাঙালির যুগ-যুগান্তের নিদ্রার তিনি ব্যাঘাত ঘটাইলেন। শুধু বাঙালি কেন, সমগ্র ভারতবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন রামমোহন। সেই হইতে নিশ্চিন্ত আলস্যে ভারতবাসী আর ঘুমাইতে পারে নাই। এক মহা-জাগরণের পথে তাহারা পদক্ষেপ করিল। রামমোহনের জীবনের ইতিহাস এই জাগরণেরই ইতিহাস। গৃহত্যাগে তাহার প্রথম সূচনা।

রামমোহন যখন গৃহত্যাগ করেন, তখন গৃহে তাঁহার দুইটি বালিকা বধূ বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রামকান্ত অতি অল্প বয়সেই রামমোহনের বিবাহ দিয়াছিলেন একটি নয়, তিনটি। সম্ভবত আট বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়া থাকিবে। প্রথমার মৃত্যুর পর বৎসরই তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় এবং তৃতীয় বিবাহ, দ্বিতীয় পত্নীর জীবতকালেই হইয়াছিল। উত্তরকালে যিনি সমাজ-সংস্কারে অবতীর্ণ হইয়া এই বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে তাঁহার জীবন-বিধাতার এক বিচিত্র পরিহাস। রামমোহনের জীবনে তাঁহার দুই স্ত্রীর কাহারও উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নাই। দ্বিতীয়ার নাম ছিল শ্রীমতী দেবী, তৃতীয়া উমা দেবী। রামমোহনের সংসারে ইহারা যথাক্রমে বড় বৌ ও ছোট বৌ নামে পরিচিতা ছিলেন। দুই জনই তাঁহাদের স্বামীর নিকট সমান মর্যাদা পাইয়াছিলেন। রামমোহন কর্তব্যপরায়ণ স্বামী ছিলেন।

রামমোহন নিজেই বলিয়াছেন: "ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে আমি গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি।" এখন হইতে প্রায় চারি বৎসর কাল অর্থাৎ বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রামমোহনের জীবনের সঠিক কোনো বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। বৃত্তান্ত না পাওয়া গেলেও তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, তিনি স্বচক্ষে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করেন। ইহাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ কালে তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রচলিত বহু শাখার সহিত পরিচিত হইয়া থাকিবেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া থাকিবেন। হয়ত ইহার জন্য তাঁহাকে দুই-একটি ভাষাও শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। তারপর তাঁহার নিজের উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি এই সময়ে ভারতবর্ষের বহির্ভূত কয়েকটি দেশেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। "আমি পৃথিবীর দূর-দূরান্ত প্রদেশে, পার্বত্য দেশে ও সমতল দেশে ভ্রমণ করিয়াছি" ('তুফাৎ উল্ মোহাদিন্'-এর ভূমিকা)। এইসব ভ্রমণ তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। বিশেষ শক্তিমান পুরুষ ভিন্ন চারি বৎসর ধরিয়া এইভাবে ভ্রমণ কি সহজ কথা ? জীবনের এই পরিব্রাজক-অধ্যায়েই রামমোহন তিব্বত পর্যন্ত গিয়াছিলেন বিদ্রোহী চিরকালই দুঃসাহসী। তাই দেখিতে পাই যে, দুর্গম হিমগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, পথের অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করিয়া তিব্বতে গিয়াও রামমোহন অবতারবাদের অর্থাৎ লামাপ্রথার ঘোরতর নিন্দা করিলেন। ভারতে পুতুলপূজা দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে যিনি সর্বসংস্কারবর্জিত বৌদ্ধ ধর্মপ্রণালী প্রত্যক্ষ করিবার জন্য লামার দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে সেখানে মানুষ-পূজা দেখিয়া বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বৌদ্ধদের গুপ্ত আচার ও ধর্মসাধন তাঁহার পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয় নাই। বুঝিলেন, কি হিন্দুধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম—সবই এখন সমান দুর্দশাপ্রাপ্ত। কথিত আছে, লামাপ্রথার নিন্দা করিতে গিয়া তিব্বতে তাঁহার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। তিব্বতে তাঁহার অবস্থানকাল দুই বৎসরের অধিক ছিল না, এরূপ অনুমান

অনেকে করিয়া থাকেন। রামমোহনের পরিচিত এবং তাঁহার সমকালীন ফরাসী পণ্ডিত গার্সিন দ্য অস্‌মিও ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

ভারত-পথিক রামমোহন এই সময়ে ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া কেবল-মাত্র ধর্মের পরিচয়ই সংগ্রহ করেন নাই; তাঁহার দুই চক্ষু যেন দশ চক্ষু হইয়া ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি—সকল স্তরই পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমি বাংলায় তিনি বিদ্যাসুন্দরী সংস্কৃতির অতিরিক্ত কিছু দেখিতে পান নাই; এখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন, ধর্মনৈতিক জীবন—সবই যেন একই ধারায় চলিয়াছে। বাংলা দেশে যে অন্ধকার, যে কুসংস্কার দেখিয়াছিলেন, বাংলার বাহিরে সর্বত্র তিনি ইহাই প্রত্যক্ষ করিলেন। রামমোহনের জীবনে এই অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয় নাই।

রামমোহন যখন অজ্ঞাতবাসে, তখন রামকান্ত রাধানগর ত্যাগ করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায় আসিয়া নূতন বাড়ি করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রায় চারি বৎসর কাল প্রবাসে নিঃসঙ্গ ও বিপদসঙ্কুল জীবন কাটাইয়া এবং বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি লইয়া রামমোহন গৃহে ফিরিলেন। রামকান্ত ভাবিলেন পুত্রের মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে; তাই তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পুনর্বার তিনি তাঁহার পিতার স্নেহলাভ করিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই রামকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা সম্পর্কে পুত্রের ধারণার পরিবর্তন তো হয়ই নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধে তিনি যেন আরো নির্ভয়ে ও বলিষ্ঠ স্বরে স্বীয় মত প্রচার করিতেছেন।

পিতা ও পরিজনদিগের সহিত আবার সংঘর্ষ বাধিল। রামমোহন আবার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। অবশ্য গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘটনা ঘটে নাই। অনুমান হয়, এই সময়ে অন্তত ছয় মাস-কাল রামমোহন তাঁহার পিতার লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়িতে ছিলেন। এই অবসরকাল তিনি বৃথা যাইতে দেন নাই। একাগ্রচিত্তে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে তর্ক হইত। প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি পুত্রের বিরূপ মনোভাব কিরূপ দৃঢ় তাহা রামকান্ত বুঝিলেন, তারিণী দেবীও বুঝিলেন। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সেদিন পুত্রের গৃহত্যাগের পর হইতে তাহার সুমতির জন্য গৃহদেবতা গোপীনাথের নিকটে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে কত প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল মধ্যেই তাঁহারা বুঝিলেন পাষাণ-বিগ্রহ তাঁহাদের সে প্রার্থনা শোনেন নাই। এমন কালাপাহাড়, কুলাঙ্গার পুত্রকে লইয়া সমাজে তো বাস করা চলে না! রায়-পরিবারের সুনাম, বংশ-মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা একদিকে, আর পুত্রস্নেহ একদিকে। সমাজই বড়ো। এককে রাখিতে হইলে অন্যকে ত্যাগ করিতে হয়। সমাজ রাখিতে গেলে সমাজদ্রোহী সন্তানকে নির্মমভাবে ত্যাগ করিতে হয়। রামকান্ত তাহাই করিলেন! রামমোহনকে গৃহ হইতে আবার তাড়াইয়া দিলেন। এইবার পুত্র একা নহে, তাঁহার দুই স্ত্রীর পর্যন্ত পিতৃগৃহে স্থান হইল না।

রামমোহন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী ও স্থিতধী। কোনো বিপদেই তিনি কখনো ধৈর্য হারাইতেন না। তখন হইতেই তিনি জীবনপথ ও লক্ষ্য স্থির করিয়া পথ চলিতে শুরু করিয়াছেন। এইবার তিনি সপরিবারে আবার কাশী আসিলেন। দীর্ঘকাল এইখানে বাস করিয়া তিনি বেদ-বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন। পিতা কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলেও, রামমোহন তাহা গ্রহণ করেন নাই। নবযৌবনের প্রারম্ভেই চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে আসিয়াছিল আত্মনির্ভরতা। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান রামমোহন তখন হইতেই কাহারো নিকট হইতে দান গ্রহণ করাকে মর্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিতেন। সেই বান্ধবশূন্য স্থানে তিনি স্বাবলম্বন দ্বারাই জীবিকানির্বাহ ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কাশীতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের জন্ম হয়। কাশীতেই তাঁহার ইংরেজী শিক্ষায় হাতেখড়ি। রামমোহনের বয়স তখন বাইশ বৎসর।

রামমোহন যখন কাশীতে, তখন রামকান্ত তাঁহার যাবতীয় বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা এইভাবে করিয়াছিলেন :—

লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ি জগমোহন ও রামমোহন, হরিরামপুরের তালুক জগমোহন, কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ি রামমোহন, বিগ্রহ ও বর্ধমানের সম্পত্তি রামকান্ত এবং রাধানগরের পৈতৃক বাড়ির অংশ রামলোচন। এই বণ্টন-নামার তারিখ ১৭৯৬-এর ১লা ডিসেম্বর। রামমোহন তখন সবেমাত্র ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ধর্মমতের জন্য রামমোহনকে গৃহে স্থান প্রদান না করিলেও, রামকান্ত রায় পুত্রের সহিত স্বাভাবিক প্রীতির বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিতে পারেন নাই। বিষয়সম্পত্তি ভাগের সময়ে রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না; রামকান্ত যে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন নাই, এ সংবাদও তিনি রাখিতেন না। পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি উহা জানিতে পারেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রামকান্তের মৃত্যু হয়। রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, মাতার সহিত মিলিত হইয়া পারিবারিক শ্রাদ্ধে যোগদান করেন নাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রামকান্তের মৃত্যুর প্রায় বিশ বৎসর পরে রামমোহন পৈতৃক সম্পত্তি গ্রহণ করেন। কারণ গৃহকর্ত্রী তখন তারিণী দেবী। সংসারের সকলই তাঁহার অধীনে। গৃহদেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি তাঁহার পরলোকগত স্বামীর জমিদারী দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন বিধর্মী বলিয়া তাঁহাকে তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইলেন। পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি মোকদ্দমা পর্যন্ত উপস্থিত করিলেন। রামমোহন ইহাতেও টলিলেন না কিম্বা বিষয়সম্পত্তির লোভে মায়ের সহিত আপোষ করিলেন না। তাহা যদি করিতেন, তাহা হইলে রামমোহন রামমোহন হইতেন না। তখনই তাঁহার জীবনপথ ও লক্ষ্য স্থির হইয়া গিয়াছে।

রামকান্তের মৃত্যুর সহিত রামমোহনের জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইল।

॥ ছয় ॥

এইবার রামমোহন উপার্জনের চেষ্টা করিলেন। তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা নবাব সরকারের চাকরি করিয়া আসিতেছেন। রামমোহন হইতে এই ধারার ব্যতিক্রম হইল। নবাবী আমল তখন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাংলায় তখন কোম্পানীর আমল আরম্ভ হইয়াছে। নূতন যুগের নূতন ব্যবস্থা। আরবী ও ফার্সী যাহা তিনি এত যত্ন করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এখন রামমোহনের কোনো কাজে আসিল না। তখন অফিস-আদালতে ইংরেজি ভাষার আদর ক্রমেই বাড়িতেছিল। জজের বা কালেক্টারির সেরেস্তাদার অর্থাৎ দেওয়ান হওয়া তখন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য ছিল। যোগ্যতা থাকিলেও ইহার বেশী উচ্চ পদ বাঙালির ভাগ্যে তখন বড়ো একটা জুটিত না।

রামমোহন একদিনে দেওয়ান হন নাই। সামান্য কেরানি হিসাবেই তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল। রামমোহনের চাকরি প্রথমে আরম্ভ হয় উডফোর্ডের অধীনে মুর্শিদাবাদে। এখান থেকেই তাঁহার 'তুফাৎ' বাহির হয়। উডফোর্ড যখন ছুটিতে যাইবেন তখন পিতার মরণাপন্ন অবস্থার সংবাদ আসিল রামমোহনের নিকট। কর্মে ইস্তফা দিয়া তিনি বর্ধমানে পিতার মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে চলিয়া আসিলেন। পিতার মৃত্যু ঘটিলে প্রচলিত আচার অনুযায়ী পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিবেকের এই অনুসরণসূত্রেই মাতা তারিণী দেবীর সহিত তাঁহার বিরোধের সূত্রপাত। ইহার পর রামমোহন ডিগবির অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সিবিলিয়ান জন ডিগবি তখন যশোহরের কালেক্টর। রামমোহন রায় তাঁহারই অধীনে কেরানিগিরি কার্যে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে রামগড় ও ভাগলপুর হইয়া তিনি রংপুরে আসেন। এখানেই তাঁহার কর্মজীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। এই ডিগবির সহিত তাঁহার পরিচয় রামমোহনের জীবনের আর একটি বিশেষ ঘটনা। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উত্তরকালে কিভাবে নিবিড় বন্ধুত্বে

রূপান্তরিত হইয়াছিল, রামমোহনের জীবনচরিত পাঠকমাত্রেই উহা জানেন। চাকরি-জীবনে প্রবেশ করিবার সময়ে রামমোহনের চক্ষে দুইটি জিনিস পড়িল—সেরেস্তাদারদের তোষামোদপ্রিয়তা হীনতা ও অসত্যপ্রিয়তা, অন্যদিকে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের ঔদ্ধত্য অভদ্রতা ও অশিষ্টাচার। রামমোহনের স্বাধীন প্রকৃতি এক্ষেত্রেও আপোষ করিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার ইংরেজ মনিবের নিকট হইতে স্বীয় উন্নত চরিত্রের বলে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে এত দূর সম্মান করিতেন যে তিনি এই অঙ্গীকার লিখিয়া দিয়াছিলেন, "অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় রামমোহন রায় আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না"। ডিগবির অধীনে রামমোহন মোট দশ বৎসর সেরেস্তাদারের কার্য করিয়াছিলেন। কেরানি হইয়া ঢুকিয়াছিলেন, পরে স্বীয় যোগ্যতায় ঐ পদে উন্নীত হন। এই যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল দুইটি—একটি ইংরেজি শিক্ষা, অপরটি সততা। দেওয়ান রামমোহন রায় ডিগবি সাহেবের যেরূপ বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তাহাতে অন্যান্য দেওয়ানদের মতো হইলে, তিনি ঐ দশ বৎসরেই বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। বাঙালির সৌভাগ্য, রামমোহন সেইরূপ দেওয়ান হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই চারিত্রিক সততাই সেদিন রামমোহনকে ইংরেজের চক্ষে পরম শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিয়াছিল। সততা এবং দৃঢ়তা—এই দুইটিই রামমোহন-চরিত্রের মূল স্তম্ভ।

কিন্তু চাকরি ছিল উপলক্ষ মাত্র, রামমোহনের লক্ষ্য ছিল টাকার উপরে নহে, ভাষার উপরে। ইংরেজি ভাষা। নূতন যুগের নূতন ভাষা। ডিগবির অধীনে কাজ করিতে করিতেই তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। কালেক্টর সাহেব যখন যেখানে বদলী হইতেন, দেওয়ান রামমোহন রায় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং ইংরেজি শিখিতে রামমোহনের উৎসাহ দেখিয়া ডিগবি সাহেব স্বয়ং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাঁহাকে উহা শিখাইতেন। প্রতিদানে রামমোহনও তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতেন। কালক্রমে ডিগবি সাহেব যখন বুঝিলেন তাঁহার এই সেরেস্তাদারটি সাধারণ সেরেস্তাদার নহেন, ইনি একটি স্ফুলিঙ্গ বিশেষ, তখন হইতেই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ মুছিয়া গিয়া উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইলেন। ইহাও কম প্রতিভার লক্ষণ নহে।

রামমোহন কিভাবে ক্রমশ ইংরেজি ভাষাজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, ডিগবির একটি উক্তি হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি: "আমি যখন রামমোহনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইয়াছিলাম, তিনি তখন ইংরেজি ভাষায় কোনো প্রকারে কথাবার্তা বলিতে পারিতেন, শুদ্ধভাবে লিখিতে পারিতেন না। দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর বিশেষ মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত সরকারী চিঠিপত্রাদি পাঠ করিয়া, ইংরেজদের সহিত আলাপাদি করিয়া এত সুন্দর সেই ভাষা শিখিয়াছিলেন যে শুদ্ধরূপে লিখিতে ও ভালরূপ বলিতে পারিতেন। তিনি সর্বদা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেন ও য়ুরোপীয় রাজনীতির সমস্ত খবর রাখিতেন।"

ডিগবির এই উক্তিটির মধ্যে একটি কথা অত্যন্ত মূল্যবান। ইংরেজি খবরের কাগজ পড়া ও য়ুরোপীয় রাজনীতির সংবাদ রাখা—ইহা রামমোহন যখন করিতেছেন, তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হইবে না। রামমোহন চাকরিতে প্রবিষ্ট হন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার দিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রামমোহন কিভাবে আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চাকরি করিয়াছিলেন, তাহা আজ ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, এই দুইটি জিনিসই ছিল তাঁহার সহজাত। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সেই মানবগুরু ইহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রামমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিভা, কার্যদক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ দেখিয়াই ডিগবি সাহেব তাঁহার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজীবন তিনি রাজার অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

অবশ্য জন ডিগবিরও অনেক গুণ ছিল, না থাকিলে রামমোহন তাঁহার প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হইবেন কেন? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ইংরেজ কালেক্টর দ্বারা বাংলাদেশে জরিপ ও জমির কর নির্ণয় করান হইত। কাজটা খুবই প্রয়োজনীয়। ডিগবি সাহেব রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া—এই তিনটি জেলার জরিপ ও করনির্দেশকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কাজ করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে কালেক্টার ও দেওয়ান—ডিগবি ও রামমোহন উভয়ে মিলিয়া বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু ডিগবি ছিলেন যথার্থ ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক ও সৎপ্রকৃতির ইংরেজ।

জনসাধারণ ডিগবি সাহেব বলিতে অজ্ঞান হইত। 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস'-লেখক জি এস. লিওনার্ড * লিখিয়াছেন যে, ডিগবির এই সুনাম অর্জনের মূলে ছিল তাঁহার দেওয়ান রামমোহনের কৃতিত্ব ও প্রচেষ্টা।

রাজকর্মচারী রামমোহন এই গুণেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া মনিব ডিগবির অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলেন। বলিয়াছি, অর্থোপার্জন রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল না; থাকিলে এত অল্প সময় চাকরি করিয়া)তাহাও আবার যেমন তেমন চাকরি নহে, কালেক্টারের দেওয়ানী) তিনি অবসর গ্রহণ করিতেন না। সারা জীবন চাকরি করিবার জন্য রামমোহনের মতো লোকেরা জন্মগ্রহণ করেন না। জীবনের ছক তিনি পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে তাঁহার জন্ম, এই বোধ রামমোহনের মনে অতি অল্প বয়সেই জাগিয়াছিল। প্রয়োজন ছিল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কিছু উপায় ও ব্যবস্থা করা। তাই দশ বৎসর চাকরি করিবার পর রামমোহন যখন দেখিলেন, তিনি যে টাকা উপায় করিয়াছেন তাহা দ্বারা বার্ষিক দশ হাজার টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন, তখন তিনি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। ইতিপূর্বেই রামমোহন বর্ধমান জেলায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুরে দুইটি তালুক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই দুইটি তালুক হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্যের সূচনা। পরে অবশ্য এই তালুক দুইটি খাজনার দায়ে নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। কলিকাতায় তেজারতি কারবারেও তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। সাধারণত বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ইংরেজরাই তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ লইত। এই সূত্রে কলিকাতার বিশিষ্ট এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজদের সহিত রামমোহন বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সরকারি চাকরির দশ বৎসর ছিল রামমোহনের উত্তরকালের কর্মজীবনের প্রস্তুতিপর্ব। রংপুরে বাস করিবার সময় নিজ বাসাতে অনেক বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি ধর্মসভা করিতেন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রচার ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। রংপুরে বাসের সময়ই

* *History of the Brahmo Samaj*: G. S. Leonard. ইহা শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে লিখিত। মিস কলেটও তাঁহার রামমোহন-চরিত গ্রন্থে এই পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

ফার্সী ভাষায় তিনি কয়েকখানি পুস্তিকা ও বেদান্তের কিয়দংশের অনুবাদও করিয়াছিলেন। আবার ইহারই ফাঁকে ফাঁকে য়ুরোপীয় রাজনীতির সংবাদ রাখিতেন। এতগুলি কাজ তিনি একসঙ্গে করিতেন, কারণ ইহা তিনি করিতে পারিতেন।

এই নিরলস কর্মানুরক্তিই ছিল রামমোহনের স্বভাব বা ধর্ম। পরবর্তীকালে কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইয়া তিনি এক মানবদেহে বহু মানবের কাজ করিয়াছেন। যুগসারথি হইতে হইলে যতগুলি গুণের দরকার—দৃঢ়তা, সততা, আত্মশক্তি, মর্যাদাবোধ, কঠোর শ্রমসাধনা, শিক্ষা, দূরদৃষ্টি, সর্বোপরি ইতিহাস-চেতনা ও সমাজবোধ—সবই রামমোহন আয়ত্ত করিয়া পথ চলিতে শুরু করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনায় রামমোহনের প্রয়াস প্রয়াসমাত্র ছিল না—উহা ছিল সংগ্রাম। সংগ্রাম ভিন্ন পুনরুজ্জীবন কোথায়?

দেওয়ান রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিলেন।

চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, রামমোহন প্রথমে রাধানগরে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি রাধাপ্রসাদের বিবাহ দেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া তাঁহার অপবাদ রটিয়া গিয়াছে। স্বগ্রামে তাঁহার উপর বহুপ্রকার নির্যাতন ও অত্যাচার হইল; স্বয়ং তারিণী দেবী পর্যন্ত একেশ্বরবাদী রামমোহনকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। রামমোহন সবই শান্তভাবে সহ্য করিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার দুই পত্নী ও নব পুত্রবধূকে লইয়া লাঙ্গুলপাড়ায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহা রামকান্তের জমিদারীর অন্তর্গত। জমিদারীর মালিক তখন তারিণী দেবী। মায়ের জলন্ত ক্রোধ ও সমাজের অপবাদ সমাজদ্রোহী রামমোহনের পিছনে পিছনে চলিল। লাঙ্গুলপাড়াতেও বাস করা রামমোহন সুবিধা মনে করিলেন না। অবশেষে তিনি সেখান হইতে কিছু দূরে রঘুনাথপুরে এক শ্মশানভূমির উপরে বাড়ি তৈরি করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই রঘুনাথপুরের বাড়িতেই কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। রাধাপ্রসাদের বয়স তখন আঠার বৎসর।

মার্টিন লুথারের সহিত রামমোহনের কিছুটা মিল দেখিতে পাই। লুথারের চরিত্রেও তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ কলঙ্কারোপ করিতে নিরস্ত হন নাই। সমাজ ও ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কুসংস্কারান্ধ লোকে যে অনেক প্রকার অমূলক অপবাদ রটনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না, ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রামমোহনের বিরুদ্ধে তাঁহার সমগ্র জীবন ধরিয়াই বহুবিধ অপবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সে সব অপবাদ অমূলক ও ঈর্ষাপ্রসূত। অপবাদ বা অপযশে পিছু হটিবার লোক ছিলেন না রামমোহন।

বহুকাল হইতেই রামমোহনের ইচ্ছা ছিল চাকরি হইতে অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় বাস করিবেন। চাকরি জীবনে কয়েকবার রাজধানীতে আসিয়া তিনি কিছু দিন বাসও করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে না পারিলে তিনি তাঁহার জীবনের আদর্শ চরিতার্থ করিতে পারিবেন না। তখন রামমোহনের বয়স চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ, পূর্ণ যৌবন বলিলেই হয়। শরীরে অসামান্য শক্তি, মনে অমিত তেজ, হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ। এই সম্পদ লইয়াই রামমোহন কলিকাতা আসিয়া তাঁহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। 'দেওয়ান রামমোহন'—এই নামটি তখন বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামলোচন রায়, ইহার কিছুপূর্বে মারা যান। কথা ছিল, তিনিই দাদার অভিপ্রায়মতো মাণিকতলায় লোয়ার সারকুলার রোডে একটি সুন্দর পাকাবাড়ি প্রস্তুত করাইয়া ইংরেজি প্রথামতো উহা সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। তখন এই দায়িত্ব অর্পিত হয় রামমোহনের অপর বৈমাত্রেয় ভাই রামতনু রায়ের উপর। ইনি নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন।

মাণিকতলার বাড়ি প্রকৃতপক্ষে রামতনু রায়েরই বাড়ি ছিল এবং তিনি এই বাড়িতে বাস করিতেন। কিন্তু তিনি রামমোহনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন বলিয়া, রামমোহন কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহাকে এইখানে অবস্থান

করিতে বলেন। কলিকাতায় এই ভবনই ছিল রামমোহনের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এইখানে বসিয়াই দীর্ঘ পনর বৎসরকালের সাধনায় তিনি একটি নূতন যুগ রচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া লোকশিক্ষক রামমোহন যেন সমগ্র বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিলেন, হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে প্রত্যক্ষ করিলেন ইহার শোচনীয় বাস্তব চিত্র। অনুভব করিলেন, সমস্ত দেশ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সর্বত্রই পৌত্তলিকতার প্রবল প্রভাব। প্রাচীন ভারতের বেদ-উপনিষদের কথা কেহ বলে না, কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র-শাসিত দেশে প্রকৃত ধর্মের মর্মজ্ঞ একজনও নাই। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজকে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদির কিছু আলোচনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু মর্ম অনুধাবনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই। অন্য বর্ণের হিন্দুরা নিরক্ষর। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সামান্য বিদ্যার সুবিধা লইয়া অন্য বর্ণের হিন্দুদের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। সমগ্র দেশ, জাতি ও সমাজ চলিতেছে অজ্ঞ, লোভী, বিদ্যাশূন্য, চরিত্রহীন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের অনুশাসনে। তিনি আরো অনুভব করিলেন, সমাজদেহে ইহার কি বিষময় ফলই না দেখা দিয়াছে। লোকে স্বাধীন চিন্তার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে, হিন্দুসমাজের নৈতিক জীবন কলুষিত, হিন্দুনারীর জীবন অসহায়। বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাধ্যতামূলক বৈধব্য, সর্বোপরি সতীদাহ প্রভৃতি নৃশংস প্রথাগুলি অবাধে চলিতেছে। কোথাও চিত্তের নির্মলতা নাই, চরিত্রের পবিত্রতা নাই। চারিত্রিক শ্লথতা ও ভাবালুতা বিস্ফোটকের মতো সমাজদেহের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবই যেন স্থবির ও স্থাণুবৎ। রামমোহন আরো অনুভব করিলেন, এই প্রাণহীন স্থিতিশীল সমাজ দেশের অনিশ্চিত ও উচ্ছৃঙ্খল রাজনৈতিক অবস্থারই ফল। দেশের নূতন শাসক ইংরেজ বাণিজ্য বিস্তার ও অর্থ উপার্জন করিতেই ব্যস্ত। শিক্ষা নাই, সুশাসন নাই, জনসাধারণের হিতকর কোনো সংস্কারসাধনের উদ্যোগও নাই।

ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা রামমোহনের হৃদয় ও মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। তখন সেই যুগসারথি বুঝিলেন তাঁহার সম্মুখে কি বিপুল কর্তব্য! স্বজাতির ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নারীর

অধিকার—এতগুলি বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ভাবী-কালের জন্য সার্বভৌমিক ভিত্তির উপরে একটি বিশ্বমানবসমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতে হইবে। ইংলণ্ড যাত্রা করিবার পূর্বে রামমোহন পনর বৎসরকাল এইসব বিবিধ লোকহিতকর কার্যে নিরলসভাবেই নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় একাকীই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, কোনো দোসর পান নাই বলিলেই চলে। এইসব কাজ করিতে গিয়া তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, বাংলার নবজাগরণের পরবর্তী ইতিহাস সেই আন্দোলন দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সেদিন একা রামমোহন বাঙালিকে ভাষা দিয়াছেন, আশা দিয়াছেন এবং সেই আশা পূর্ণ করিবার জন্য পথের সন্ধানও দিয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী জ্ঞানে ও কর্মে যাহাতে মিলিতে পারে, তাহার জন্য সুদীর্ঘ পনর বৎসরের অক্লান্ত সাধনায় রামমোহন প্রশস্ত রাজপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই অসাধ্যসাধন আর কেহ করিতে পারিত না। তাঁহার এই পনর বৎসরের কর্মজীবনই রামমোহনের প্রকৃত জীবন। এইবার আমরা সেই জীবনের পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব।

এই পরিচয়ের মধ্যেই আছে বাংলার সেই পুরুষকারের, মনুষ্যত্বের ও মুক্তি-সাধনার মাহাত্ম্য। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র রামমোহনের ছিল না, প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল এক মানবাত্মার সংগ্রাম। দুঃখের বিষয়, রামমোহনের যে গভীর তপস্যা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কন প্রয়াস, তাহার অনুশীলন আজো সর্বভারতীয় হইয়া উঠিল না। আজ আমাদের চারিদিকে, সমাজ ও জীবনের সর্বস্তরে যে শোচনীয় অবক্ষয় আর অধঃপতন লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে মনে হয় আজিকার এই দুর্দিনে রামমোহনের বাঁচিয়া থাকা দরকার ছিল। সেই মুক্তিমন্ত্রের, সেই বিরাট জ্ঞান সমন্বয়ের প্রবক্তার স্মরণ আজ বিশেষভাবেই প্রয়োজন হইয়াছে।

॥ সাত ॥

কি স্বদেশে, কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

একেশ্বরবাদী রামমোহনের ধর্মসাধনার মর্মবাণী তাঁহার রচিত এই সঙ্গীতটির মধ্যে সুন্দররূপে বিধৃত হইয়াছে।

মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন, "মানবসভ্যতায় রাজা রামমোহন রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইল সকল ধর্মের তুলনামূলক অনুশীলন। এই বিজ্ঞানের কথা তাঁহার পূর্বে কেহ জানিত না, কিম্বা কোনো ধর্মসংস্কারকই উহা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। বুদ্ধ হইতে শ্রীচৈতন্য, কোনো ঐতিহাসিক ধর্মসংস্কারকের মুখে আমরা তুলনামূলক ধর্মালোচনার কথা শুনি নাই।" রামমোহন-প্রবর্তিত এই নব সমন্বয়-বিজ্ঞানই পৃথিবীতে বিশ্বমানবতাবাদের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। একথা মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে রামানুজ, শঙ্কর, নানক ও চৈতন্যদেবের প্রতিভায় যে জিনিস ধরা পড়ে নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহনের চিন্তায় সেই জিনিস—তুলনামূলক ধর্মানুশীলন সর্বপ্রথম ধরা পড়িয়াছিল। রামমোহনের এই চিন্তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বিরাট পদক্ষেপ।

খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র জানিবার পূর্বেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে রামমোহন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের (হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী) নিকট তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তৎপূর্বেই কাশীতে হিন্দুশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরিশেষে ষোল বৎসর বয়সে তিব্বতে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের ফলে তাঁহার মনে একেশ্বরবাদ দৃঢ় হইয়াছিল। পরিব্রাজক জীবনের পর রামমোহনের জীবনের বড়ো ঘটনা হইল দীর্ঘকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা। এই অনুশীলন তিনি যে গভীরভাবে করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। গভীরতা

রামমোহন-মানসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রামমোহন-চরিত্রে পল্লবগ্রাহিতার স্থান ছিল না, যেমন ছিল না কোনো প্রকার তরল ভাবাবেগের। নগেন্দ্রনাথের রামমোহন-চরিতে তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের চর্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিলেও রামমোহন জোর দিয়াছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের উপরে আর শঙ্করাচার্য জোর দিয়াছেন সন্ন্যাসের উপরে—ইহাই নগেন্দ্রনাথ প্রমুখ রামমোহন-চরিতকারগণের সিদ্ধান্ত। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে কিন্তু পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ বলিতে চান। কিন্তু রাধাকৃষ্ণন শাঙ্করদর্শনের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, হিন্দুমনীষার এই শ্রেষ্ঠ অর্জন অদ্বৈতবাদ রামমোহন যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, সেইভাবেই তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা হয়ত সঙ্গত।

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্রের বিচার যেমন মৌলিক তেমনই বিস্ময়কর। হিন্দুর সুদীর্ঘ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি যেভাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ-তত্ত্ব আমাদের উপহার দিয়াছেন, তাহা যে কত বড়ো দান তাহা আজ পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কি না সন্দেহ। প্রতীক উপাসনার কোনো মূল্য নাই—এমন নির্মম কথা রামমোহনের পূর্বে এতখানি জোর দিয়া আর কোনো হিন্দুধর্মসংস্কারক বা সাধক বলিতে পারেন নাই। রামমোহন পারিয়াছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন নূতন মানুষ—নূতন সমাজবিপ্লবের অন্তর ভেদ করিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে প্রতীক উপাসনার বিরোধী বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদিদল মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু সংখ্যায় ও প্রভাবে তাহারা এমনই নগণ্য ছিল যে, তাহাদের কথা উল্লেখ না করিলেও চলে। পৌত্তলিকতা বা প্রতীক উপাসনার প্রতি এরূপ বিরাগের জন্য যে রামমোহন তাঁহার সমকালে হিন্দুসম্প্রদায় দ্বারা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং বর্তমানকালেও অনেকখানি অবহেলিত হইতেছেন, ইহা সত্য।

মানবসভ্যতার নব সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন রামমোহন। সেইজন্যই তিনি তাঁহার দেশবাসীকে অতীত বা বর্তমান প্রীতির পরিবর্তে কালশ্রেয়স্ ও বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্রের যথাযোগ্য

সমাদর হয় নাই—রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ সত্ত্বেও হয় নাই। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি আমরা সকলেই জানি :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥

ঋষি বলিয়াছেন যে, সকলই দেখিতে হইবে সেই ঈশ্বরকে দিয়া আচ্ছন্ন করিয়া, তাঁহার দান ভোগ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত ক'রে, কেবল বাঙালিকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন।·· এইখানেই তাঁর বিশেসত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন।"

এইখানেই রামমোহন যুগপৎ প্রাচীন ও আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলিয়াছেন : "তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তি-পূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তি-পূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই বিশ্বমানবতার উপলব্ধি ভিন্ন রামমোহনের ধর্মসংস্কারকে বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াই রামমোহন বিশ্বমানবতায় পৌঁছিয়াছিলেন। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় রামমোহনের এই বিশ্বমানবতা যে কত বড়ো একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, আজ বোধ হয় তাহা আমরা কিছুটা বুঝিতে পারিয়াছি।

"ভাব সেই একে"—রামমোহনের এই প্রসিদ্ধ বাক্যটির মধ্যে ধর্মজগতে যে কত বড়ো বিপ্লবের ইঙ্গিত ছিল, তাহা যদি আমরা সেদিন সমস্ত হৃদয়মন দিয়া বুঝিতে এবং গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা উপশাস্ত্র ও অপধর্মের গ্লানি হইতে বহুপূর্বেই মুক্ত হইতে পারিতাম এবং আধ্যাত্মিকতায় আরো বড়ো হইতাম। রামমোহনের জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে কি আজো বরণ করিয়া

লইবার দিন আসে নাই? আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি আজো রামমোহনের জীবনেতিহাসের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না, মন দিয়া বুদ্ধি দিয়া রাজার চিন্তাভাবনাকে সে গ্রহণ করিল না। যদি করিত তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্রবিচারে কত চমৎকারিত্ব রহিয়াছে, পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির কি অভিনব স্ফুরণই না সেখানে হইয়াছে!

ভারতে দার্শনিক ও ধর্মগুরু আমরা অনেক পাইয়াছি। পাই নাই শুধু এমন একটি মনীষা যাহা ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, সাহিত্য সব কিছুকে মিলাইয়া মিশাইয়া বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র জনশক্তিকে লইয়া এক সর্ব-ভারতীয় মন্ত্রে উদ্বোধিত করিবে। রামমোহনের সেই মনীষা ছিল। জাতি, মানব ও রাষ্ট্রের সার্থকতার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ধর্মানুশীলন। জীবনকে তিনি দেখিয়াছেন সমগ্রভাবে, মানুষকে দেখিয়াছেন পূর্ণ মানব হিসাবে আর সমাজকে দেখিয়াছেন জীবন ও মানুষের ভিত্তিভূমি হিসাবে। ধর্মাচারপ্রধান দেশ এই ভারতবর্ষে রামমোহনের পূর্ব পর্যন্ত মোক্ষই ছিল মুখ্যবাণী। জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র—ইহাদের স্থান ছিল গৌণ, কিম্বা আদৌ ছিল না। রামমোহনের ধর্মবোধ প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করিয়া পরিবার, সমাজ ও জাতীয় ক্ষেত্রে সব কিছু লইয়া যে পূর্ণ মানব, তাঁহারই জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখ্য: "আমি বিশ্বাস করি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান—একটা বিষয়ে সকলেই একমত হইবেন যে. ধার্মিক হইতে হইলে 'যোগী' বা 'সতী' হইবার কোনও প্রয়োজন নাই, এবং বনে যাইবারও দরকার করে না, পরন্তু গৃহ ও সমাজই ধর্মের প্রশস্ত ও সর্বোত্তম ক্ষেত্র, জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা শিক্ষিত হিন্দুর চক্ষু প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত করিবার কৃতিত্ব-গৌরব রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য।"

সকল ধর্মের মর্মানুসন্ধানী রামমোহনের পক্ষে খ্রীষ্টধর্মকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। রামমোহন হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার *Precepts of Jesus—a guide to peace and happiness*-এর ভূমিকায় রামমোহন বলিয়াছেন, খ্রীষ্টের এই যে উপদেশ অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর, মানুষের

নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্মগ্রন্থে পান নাই। ধর্মশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা উচ্চে তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, খ্রীষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ববর্জিত বাইবেল। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে কলিকাতায় সমাগত গোঁড়া খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ রামমোহন-কৃত বাইবেল-ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পাদ্রীদের এই অসন্তোষের ফলেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষানির্ণয়ে রামমোহন দীর্ঘ তিন বৎসরকাল সুকঠোর পরিশ্রম করেন। তিনখানি সুবিস্তৃত গ্রীক ও হিব্রুবচন-সম্বলিত *Appeal to Christian Public* গ্রন্থ তাঁহার এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া তৎকালীন খ্রীষ্টান-জগৎ চমকিত হইয়াছিল। তাঁহার এই খ্রীষ্টান-শাস্ত্র-বিচারের ভিতর দিয়া সেদিন এই কথাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই রামমোহন কাম্য মনে করিতেন। সেদিনের পৃথিবীতে এমন চিন্তা দুর্লভ ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনকে এই কারণেই বিশ্বমানব বা 'Universal man' আখ্যা দিয়াছিলেন।

এইভাবে একে একে মুসলিম সাধনা, হিন্দু সাধনা ও খ্রীষ্টধর্মের গভীরে প্রবেশ করিয়া রামমোহনের সাধনা কোন্ রূপ লইয়াছিল, এইবার আমরা তাহা আলোচনা করিব। তাঁহার মানসজীবনের উপর এই তিনটি ধর্মেরই প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ছিল; তাঁহার জীবনাদর্শ বহুল পরিমাণে কোরান-বাইবেল-উপনিষদের ভাবধারায় গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই সর্বজনীন ও সর্বসংস্কার-মুক্ত বিশ্ববোধের সার্থক আদর্শকেই তিনি আত্মীয় সভার মঞ্চ হইতে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। এই আত্মীয় সভা স্থাপন রামমোহনের সংস্কারক-জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তি। বাংলার পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাসে রামমোহনের আত্মীয় সভার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহা স্থাপিত হয়। আত্মীয় সভার কথা পরে বলিব।

•

রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু ও মুসলিম এই দুই প্রবল ভাবধারার সঙ্গমস্থল ছিল—তাঁহার ধর্মমত আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের মনে রাখা

দরকার। রামমোহনের সাধনার মর্ম বুঝিবার পক্ষে প্রথমেই তাঁহার 'তুহ্ফাৎ-উল্ মুয়াহ্হিদীন' গ্রন্থখানির উল্লেখ অপরিহার্য। ইহাতে কোরানের কয়েকটি বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে। মুসলিম সাধনা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব, অথবা তাঁহার চিত্তের উপরে মুসলিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ বুঝিতে হইলে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে হয়। কথিত আছে, ডিগবির অধীনে কর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে রামমোহন কিছুদিনের জন্য মুর্শিদাবাদে বাস করেন। 'তুহ্ফৎ' গ্রন্থখানি সেইখানেই লিখিত হয়। ইহার বাংলা অর্থ—একেশ্বরবাদীদিগকে প্রদত্ত উপহার। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে রামমোহন বইখানি প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর। এই গ্রন্থেই আমরা তাঁহার মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। ইহাতে তিনি মানুষের ধর্মজীবনে বিচারবুদ্ধির কার্যকারিতার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন—বলিয়াছেন, সকল ধর্ম আত্মা ও পরকাল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; যদিও দুইটি জিনিসের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তথাপি ইহাতে বিশ্বাস দোষার্হ নয়, কেননা মানুষ দুষ্কর্ম হইতে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সহিত বহু অকল্যাণকর ও বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস সম্মিলিত হইয়াছে ও তাহাতে মানুষের দুঃখ বাড়িয়া গিয়াছে। তবু মানুষের অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে, এইসব বিশ্বাস সত্ত্বেও সে যদি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়, তাহা হইলে কি সত্য আর কিই বা অসত্য, তাহা সে নিরূপণ করিতে পারিবে আশা করা যায় এবং এইভাবে অর্থহীন ধর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক অদ্বিতীয় মঙ্গলবিধাতার প্রতি ও সমাজকল্যাণের প্রতি মনোযোগী হইতে পারিবে। এই গ্রন্থে রামমোহন স্পষ্টতই অলৌকিকতানিরপেক্ষ একেশ্বরতত্ত্বে ও লোকশ্রেয়ঃ-বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। এখানে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই একদিকে যেমন প্রখর যুক্তিবাদী, অন্যদিকে তেমনি সহজভাবে ঈশ্বরানুরাগী ও মানবকল্যাণকামী।

রামমোহনের সংস্কার-চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণে দুইজন মনীষীর মত এইখানে উদ্ধৃত করিব। ইঁহারা রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। দুইজনেই রামমোহনের সাধনার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "বিশ্বমানবের একত্ববোধ তাঁহার সমকালে জগতে আর কাহারো ভিতরে এমন

পূর্ণভাবে দেখা যায় নাই। বর্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন অবিনশ্বর যাহা কিছু তাহা আয়ত্ত করিয়া অন্যান্য সাধনার প্রতি রামমোহন হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন।” ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহনকে দাঁড় করাইয়াছেন জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্মোদ্ঘাটকরূপে। “রামমোহনের মতে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা হইতেছে বিশ্বজনীনতার একটি রূপ, ইহার কোনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তাহার সর্বোচ্চ পরিণতির দিকে। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া রামমোহন তাহাদের সেই সর্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।”

মূলত ইসলাম ও খ্রীষ্টশাস্ত্র চর্চার ফলে রামমোহনের চিত্তে একেশ্বরবাদের প্রতি আসক্তি এবং পৌত্তলিকতার প্রতি বিরাগ দানা বাঁধিয়া উঠে; পরে বৈদিক শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নব অনুরাগ দেশীয় জীবন-ভূমিতে নবীন ধর্মবোধ রচনার ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়। সুতরাং রামমোহন হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান—এই প্রশ্ন নিরর্থক। রামমোহনের একটিমাত্র পরিচয়ই আছে। তিনি মানবগুরু। তিনি সত্য-জিজ্ঞাসু। জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই সত্য-জিজ্ঞাসু। এই সত্য-জিজ্ঞাসার প্রেরণাতেই মানুষ ধর্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক, দার্শনিক ইত্যাদি অনেক কিছু হইতে পারেন। এক-একজন এক-একটি শ্রেণীর অন্তর্গত। শক্তিমান রামমোহন একই সঙ্গে সব ছিলেন। এইজন্যই ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনকে ‘বহুমুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি মানুষ’ এই আখ্যা দিয়াছেন। এক জীবনে একসঙ্গে এতগুলি ক্ষেত্রে কার্য করা, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত আর কেহই পারেন নাই। রামমোহনের প্রবণতার কেন্দ্র ছিল মানুষ; তাই তিনি সর্বক্ষেত্রে সমান প্রতিভা ও শক্তি লইয়া কার্য করিয়াছেন।

॥ আট ॥

রামমোহনের ধর্মজীবনের প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইনি হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত। রামমোহনের ধর্মজীবনের গতি অনেকটা ইঁহারই প্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সংসারাশ্রমে ইহার নাম ছিল নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। রামমোহন অপেক্ষা ইনি নয় বৎসরের বড়ো ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই রামমোহন নন্দকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তারপর রামমোহন যখন রংপুরে সরকারী কার্যে নিযুক্ত তখন হরিহরানন্দ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। বন্ধুত্ব পূর্ব হইতেই ছিল। এখন উহা দুইজনের মধ্যে দৃঢ় হইল। কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন সুপণ্ডিত হরিহরানন্দকে কাশী হইতে তাঁহার নিকট আনাইলেন। হরিহরানন্দ বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্র অনুসারে ইনি ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, রামমোহন ইহার নিকট মহানির্বাণতন্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবেন এবং মহানির্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মচক্র হইতেই তিনি ব্রহ্মসভার ইঙ্গিত পাইয়া থাকিবেন। হরিহরানন্দ কলিকাতায় রামমোহনের মাণিকতলার ভবনেই তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেন, তন্ত্রমতে সাধনাদি করিতেন ও অন্য সময়ে বন্ধুর সহিত শাস্ত্রচর্চা করিতেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহনের একজন অনুগামী ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য হইবার সৌভাগ্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই লাভ করিয়াছিলেন।

১৮১৬।

রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। সঙ্গে আসিলেন ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়—রাজার প্রথম শিষ্য। ইনি মাতুলকে খুব ভালবাসিতেন, রামমোহনও গুরুদাসকে খুব স্নেহ করিতেন। লাঙ্গুলপাড়ার পৈতৃক ভিটার অর্ধেক অংশ তিনি ভাগিনেয়কে দান করিয়াছিলেন। রাধানগরে রামমোহনের উপর যখন নির্যাতন হয় তখন গুরুদাস মাতুলের পক্ষে লাঠি ধরিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতেই রামমোহনের

রণভেরী বাজিয়া উঠিল। পৌত্তলিকতা আর সকল রকম উপধর্মের বিরুদ্ধে রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সাত বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই সাত বৎসরের প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনার, প্রতিটি বিচার-বিতর্কের আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করিতে পারিলে কেবল মাত্র ধর্মসংস্কারক রামমোহন সম্পর্কেই একখানি বিরাট গ্রন্থ বিরচিত হইতে পারে। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন: "কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেবল কলিকাতায় কেন, সমুদয় বঙ্গভূমিতে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিল। বাবুদিগের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে, পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, যেখানে সেখানে রামমোহনের কথা। অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না।"

সমসাময়িক ইতিহাসের আলোকসম্পাতে আমরা এখন জানিতে পারিয়াছি যে, এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। সত্যই, ব্যাপার এইরকমই ঘটিয়াছিল সেদিন। ভট্টাচার্যেরা ঘন ঘন নস্য লইয়া ও মস্তকের শিখা আন্দোলিত করিয়া রামমোহনের শ্রাদ্ধ করিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও পুরোহিত-সম্প্রদায় তাঁহাকে দুইবেলা নরকে পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত সুর মিলাইয়া গোঁড়া পাদ্রী ও মৌলবী-মোল্লার দলও রামমোহনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেন। মাণিকতলায় তরঙ্গ উঠিল, শোভাবাজার পর্যন্ত টলমল করিয়া উঠিল। কলিকাতার সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের সমাজপতি তখন রাধাকান্ত দেব। এই রাধাকান্ত দেব প্রথম জীবনে রামমোহনের এবং পরবর্তী জীবনে বিদ্যাসাগরের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি রামমোহনের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন এবং ইনিই ধর্মসভা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মসভার পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন। রামমোহন সমাজদ্রোহী, রামমোহন ঘোরতর পাষণ্ড, রামমোহনের ধর্ম খ্রীষ্টীয় ধর্মেরই এক অভিনব সংস্করণ। সেদিন ধর্মসভার বেদী হইতে ভাড়াটিয়া পণ্ডিত দ্বারা জোর গলায় এইসব কথাই প্রচার করা হইত।

শত্রু যেমন হইয়াছিল, তেমনি অনেক আবার তাঁহার মিত্রও হইয়াছিল। তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা, গভীর পাণ্ডিত্য ও মধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সম্ভ্রান্ত লোকই রামমোহনের সহিত সখ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিয়মিতভাবে তাঁহার মাণিকতলার বাড়িতে যাওয়া-আসা করিতেন। সকলেই যে ধর্মের কথা আলোচনা করিতে আসিতেন, এমন নহে; বরং বেশির ভাগ লোকই বৈষয়িক বিষয়ে রাজার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। শাস্ত্রবিচারে মাণিকতলার বাসভবন সর্বদা মুখরিত থাকিলেও, একথা ঠিক যে রামমোহনের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকলের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন না বা ধর্মসংস্কার বিষয়ে তাঁহার মতামত সকলের নিকট উল্লেখও করিতেন না। রামমোহনের এইসব সঙ্গী ও শিষ্যগণের মধ্যে তৎকালীন কলিকাতা ও বাংলাদেশের প্রথমশ্রেণীর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তদের প্রায় সকলেই ছিলেন। এছাড়া কয়েকজন সুপণ্ডিতও সর্বদা রামমোহনের সঙ্গে থাকিতেন। স্থানীয় ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একজন ডেভিড হেয়ার, অন্যজন শ্রীরামপুরের উইলিয়ম কেরী। হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও হিন্দুকলেজ স্থাপনের সূত্রেই, আর কেরী সাহেবকে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে কেরীর বাড়িতে পারিবারিক উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য রামমোহন কতবার আসিয়াছিলেন। একবার কেরী সাহেব বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে রামমোহনকে ওয়াট সাহেবের লেখা একখানি ধর্মসঙ্গীত-পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। সেই বই পাইয়া, কথিত আছে, রামমোহন বলিয়াছিলেন, "আমি ইহা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিলাম।" য়ুরোপ যাইবার সময়েও এই বইখানি তাঁহার সঙ্গে ছিল।

বাংলাদেশে তখন বেদ ও বেদান্তের চর্চা লোপ পাইয়াছে। বৈদিক বা বৈদান্তিক প্রণালী কেহ অনুসরণ করিত না। রামমোহন তাই বেদ ও উপনিষদ লইয়া তাঁহার সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র ও যুক্তি—ইহার সাহায্যে রামমোহন লোকের মতি পরিবর্তন করিতে চাহিলেন। শাস্ত্র বলিতে তিনি বুঝিতেন উপনিষদ ও বেদ। প্রথম উদ্যোগেই তিনি সংস্কৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন ও লোকসমাজে বিতরণ করিলেন। বাংলাদেশে নূতন করিয়া বেদান্তচর্চার প্রসারের জন্য রামমোহনের প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা-ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা

প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বেদান্ত গ্রন্থ' বাংলা অক্ষরে ছাপা হইয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ধর্মসংস্কারে ইহাই ছিল রামমোহনের ব্রহ্মাস্ত্র। হিন্দু-ভারতের সম্মানিত শাস্ত্র বেদান্ত। রামমোহন ইহা দ্বারাই সেদিন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'বেদান্ত গ্রন্থ'ই রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরও ইহা একটি বিশিষ্ট সম্পদ। রামমোহনের সময়ে বাংলাদেশে বেদান্তের চর্চা ছিল না; উপনিষদের নাম তো কেহ জানিত না। রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় আছে: "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তসূত্র-গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের কর্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্বলোকমান্য শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল।" বস্তুত 'বেদান্ত গ্রন্থ' রামমোহনের প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

রামমোহন তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন: "আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল।" তাঁহার এই উক্তির সহিত বেদান্তসূত্রের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকাটি পাঠ করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, সত্যই তিনি কখনো হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন নাই, আঘাত করিয়াছিলেন। প্রচলিত কোনো ধর্মকেই তিনি আক্রমণ করেন নাই, আক্রমণ করিয়াছেন অপধর্ম আর উপশাস্ত্রকে, আঘাত করিয়াছেন পুরোহিত-মোল্লা ও পাদ্রীতন্ত্রকে। সেদিন ইহার প্রয়োজন ছিল। এইভাবেই তিনি সেদিন ধর্মবিজ্ঞানের অর্থাৎ Science of Religior-এর প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ধর্মকে কল্পিত অলৌকিকত্ব হইতে নামাইয়া আনিয়া উহাকে রামমোহন একটি যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন।

ভূমিকার এক স্থানে রামমোহন লিখিয়াছেন: "আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়া বিবেক ও সরলতার নির্দেশে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমার প্রবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র হইয়াছি। সে নিন্দা বা তিরস্কার ক্রমে সঞ্চিত হইয়া যত বড়ই হউক না কেন, আমি এই বিশ্বাসে ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে পারি যে, একদিন আসিবে, যখন আমার এই সামান্য চেষ্টা লোকে ন্যায়দৃষ্টিতে দেখিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবে। লোকে যাহাই বলুক না কেন, এই সান্ত্বনা হইতে আমাকে কেহই বাঞ্চিত করিতে পারিবেন না যে আমার আন্তরিক অভিপ্রায়গুলি সেই পরমপুরুষের নিকট গ্রাহ্য যিনি গোপনে দেখিয়া প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।"

রামমোহনের এই সরল ও অকপট উক্তিটির মধ্যে তিনটি কথা লক্ষ্য করিবার মতন—তাঁহার আত্মবিশ্বাস, তাঁহার অভিপ্রায়ের আন্তরিকতা আর নিন্দা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা। কিন্তু আমরা কি রামমোহনের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ আজো পরিশোধ করিতে পারিয়াছি?

দুরূহ 'বেদান্ত গ্রন্থ' সাধারণের বোধগম্য হইবে না, ইহা রামমোহন বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন উহার তাৎপর্য বা সার সঙ্কলন করিয়া 'বেদান্তসার' প্রকাশ করিলেন। উহার ইংরেজি ও হিন্দী অনুবাদও তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। 'বেদান্তসারের' ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। সংস্কার-আন্দোলনকে ব্যাপক ও প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য যুগপৎ তিনটি ভাষার সুবিধা গ্রহণ করা রামমোহন-প্রতিভার আর একটি দিক। 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ তিনি ইংলণ্ডে ডিগবি সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। ডিগবি সাহেব লণ্ডনে উহা একটি স্বতন্ত্র ভূমিকাসহ পুনর্মুদ্রণ করেন। 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ ডিগবিকে পাঠাইবার সময়ে রামমোহন তাঁহাকে একখানি সুদীর্ঘ পত্রও লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রে তিনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরবর্তী তিন বৎসরকালের সংস্কার-প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন। ডিগবির সহিত রামমোহনের বন্ধুত্ব না থাকিলে তিনি উহা করিতেন না। রামমোহন তাঁহার বিচার-বিতর্কমূলক প্রায় সকল পুস্তিকারই হিন্দী এবং ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করিতেন। ইংরেজী অনুবাদ ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত

হইত। ইহা দ্বারা তিনি সংস্কার-আন্দোলনকে সর্বভারতীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বৃথা ভারতপথিক বলিয়া অভিহিত করেন নাই। রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া রামমোহন সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতির কথাই চিন্তা করিতেন। ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি আন্তর্জাতিক বা বিশ্বপথিক রামমোহন।

ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে রামমোহন কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ প্রভৃতি পাঁচখানি উপনিষৎ বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশ করিলেন এবং পূর্ববৎ বিতরণ করিলেন। এইগুলির তিনি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনুবাদের সহিত ভূমিকা ও মন্তব্য থাকিত। সবই নিজের ব্যয়ে ছাপাইতেন। এইসব মহৎ কাজ নিশ্চিন্ত মনে করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কাহারও চাঁদার ভরসায় রামমোহন কোনো সংস্কার-প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। নিজের অর্থে ছাপাইতেন এবং বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। তাঁহার কর্মপদ্ধতিই ছিল স্বতন্ত্র।

যে সময়ে তিনি হিন্দুশাস্ত্র ছাপাইয়া প্রচার করেন, সেই সময়েই তিনি 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন' ও 'মনাজিরাৎ-উল আদিয়ান' (বিবিধ ধর্মের বিচার) নামক ফার্সী ভাষায় লিখিত বই দুইখানি প্রকাশ করেন। এই দুইখানি গ্রন্থেই তিনি শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ এবং একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। ফার্সী ভাষা তখনো দেশের এক বৃহত্তম শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়াই রামমোহন ঐ ভাষারও সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সব গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপে রামমোহনের নাম ছড়াইয়া পড়িল, পাশ্চাত্ত্য দেশ তাঁহাকে একজন মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কারক বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। আর স্বদেশে তিনি পুরস্কার পাইলেন তিরস্কার—স্বধর্মদ্রোহী ও হিন্দুজাতির পরম শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রাচীনের দল তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তি লইয়া রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিচার ও তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। একটি ঘুমন্ত জাতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটুক, নিশ্চিন্ত আলস্যের শয্যা হইতে সে একবার গাত্রোত্থান করুক, রামমোহন ইহাই চাহিয়াছিলেন। তাই তিনিও তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, গভীর পাণ্ডিত্য,

প্রতিভা, সাহস ও বাগ্মিতা লইয়া রণাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। বহু পণ্ডিতের সহিত মুখে ও কলমে যুদ্ধ হইল। এইসব ঘটনার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের বিচারযুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

রামমোহনকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক মনীষিবৃন্দের জীবনীও আলোচনা করিতে হয়। রামমোহনের সহিত যে সব পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাদের কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। দুঃখের বিষয়, রামমোহনের কোনো জীবনচরিতকার ইঁহাদের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেন নাই। রামমোহনের প্রতিপক্ষদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সর্বাগ্রগণ্য। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামে রামমোহনের একখানি পুস্তিকা আছে। ঐ পুস্তকের ভট্টাচার্যটিই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)।

হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞান ছিল। ষড়্‌দর্শনে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। এইজন্য তিনি সে যুগে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। কেরী, মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ইংরেজ পাদ্রীরা পর্যন্ত তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে রামমোহনের ঘোরতর আন্দোলন স্বভাবতই মৃত্যুঞ্জয়কে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং রামমোহনের রচিত যে সব পুস্তকাদিতে ইহার অসারতা প্রমাণিত হইয়াছিল, সম্ভবত তিনি সেগুলি পাঠ করিয়া থাকিবেন। রামমোহন যখন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া সংস্কার-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তখন কলিকাতার সমাজে মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। তিনি প্রতিমা-পূজার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। ইহা রামমোহনের 'বেদান্তসার' গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরবর্তী ঘটনা। রামমোহনের সহিত তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার এই সময়েই হইয়া থাকিবে। সুপ্রিম কোর্টে পণ্ডিতী করিবার সময়ে মৃত্যুঞ্জয় জনহিতকর কার্যেও মন দিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-পর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের গৃহে প্রথম যে সভাটি হইয়াছিল (১৮১৬, ১৪ই মে), সেই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় এক-

জন এবং বিদ্যালয়সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠনের জন্য আটজন ইংরেজ ও কুড়িজন এদেশীয়দের লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, মৃত্যুঞ্জয় সেই কমিটিরও অন্যতম সভ্য ছিলেন। সুতরাং রামমোহনের পক্ষে এইরূপ একজন প্রতিপত্তিশালী ও সুপণ্ডিত প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করা স্বাভাবিক ছিল। মতের বিরোধ সত্ত্বেও মানুষকে রামমোহন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'রও ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছিল। অনুবাদ করেন স্যর ডব্লিউ. এইচ. ম্যাকনটন। অনুবাদকের মতে সমসাময়িক একজন ভারতীয়ের দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ নিগূঢ় আলোচনা বড়ই বিস্ময়কর। কথিত আছে, রামমোহনের মাণিকতলার আবাসে আসিয়া তাঁহার সহিত প্রতিমা-পূজা বিষয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে রামমোহন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতায় উহাতে সম্মত হন এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয় আসিলে পরে তিনি স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও বাংলা ভাষায় মৃত্যুঞ্জয় যে ব্যুৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিতে রামমোহন কুণ্ঠিত হন নাই। অনুগামী ও বিরোধী সকলকেই রামমোহন সমান চক্ষে দেখিতেন। এই রকম উদারতা এই মানবগুরুর চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শাস্ত্রীর সহিত বিচারের ঘটনাটি এইরূপ।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস। স্থান—বড়বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়ি। মাদ্রাজের বিখ্যাত পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী রামমোহনকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রীমহাশয়ের তখন ভারতবিশ্রুত খ্যাতি। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি হিন্দু সমাজের বহু গণ্যমান্য প্রতিনিধি সেদিন এই অদ্ভুত দ্বৈরথের সাক্ষী ছিলেন। চৌবের বাড়িতেই সভা বসিল। রামমোহন আসিলেন। শালপ্রাংশু মহাভুজ, সেই দীর্ঘ উন্নত আর্যসৌষ্ঠবমণ্ডিত-দেহ—মাথার উপর প্রকাণ্ড একটি পাগড়ী, অতি পরিচ্ছন্ন রাজকীয় পরিচ্ছদ—রামমোহন সভায় আসিলেন। তুমুল তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এ যেন মণ্ডণ মিশ্রের সহিত আচার্য শঙ্করের তর্ক, যেন শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রকাশানন্দের তর্ক। উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতায় সেদিন

এই যে দৃশ্যটি ঘটিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আমরা আজ পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। বেদবর্জিতের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই বলিয়া সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী যে বিচার উত্থাপন করিলেন, রামমোহন তাহার উত্তর সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে দিলেন। রাজার অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগের সম্মুখে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞান ভাসিয়া গেল, তিনি নির্বাক হইয়া নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করিলেন। ভারতবাসী বুঝিল বাঙালির মেধা কি? পরে হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় এই প্রসিদ্ধ বিচার ছাপা হইয়াছিল। মাদ্রাজের শংকর শাস্ত্রীর বিতর্কের প্রতিবাদও এই সময়কার আর একটি ঘটনা।

এইভাবে সাকারবাদের বিরুদ্ধে ও ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে রামমোহনকে অসংখ্য বিতর্ক-বিচারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার জীবনচরিতকারগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে সে দীর্ঘ ইতিহাস লিখিবার স্থান নাই। পণ্ডিত, গোস্বামী, ভট্টাচার্য, পাদ্রী—সকলের সহিতই তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল এবং সর্বত্র রামমোহন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়া তাঁহার জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন। রামমোহনের ছিল প্রতিভা, জ্ঞান ও যুক্তি—ইহাই সম্বল করিয়া সেদিন তিনি ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিলেন। এইসব বাদানুবাদ ও ধর্মযুদ্ধ চালাইতে গিয়া তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দীতে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সংস্কার-কাজের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই ব্যাপারে রামমোহনকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারিব না। অবশ্য বইগুলি আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু তাহাতে প্রমাণস্বরূপ যে সব শাস্ত্রীয় বচন তিনি উদ্ধৃত করিয়া দিতেন, তাহা সঙ্কলন করা কি কম পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার! তাঁহাকে রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইত, তাহার অর্থ বুঝিতে হইত। তিনি পরের মুখে ঝাল খাইতেন না, টাকা দিয়া পাণ্ডিত্য ক্রয় করিতেন না। কথিত আছে, রামমোহন তাঁহার মাণিকতলার বাড়িতে রাত্রি দুইটা বা তিনটা পর্যন্ত একাগ্র চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন ও লিখিতেন।

প্রসঙ্গত তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য : "সকল মানুষের মধ্যেই রামমোহনকে একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক বলা যায়। এক দিকে তাঁহার জাতি, পদমর্যাদা ও সম্ভ্রম, অপর দিকে তাঁহার লোকহিতৈষণা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের প্রাধান্য, এই সমস্তই তাঁহাকে অপর সাধারণ লোক হইতে পৃথক করিয়া দেয়। তাঁহার এই সব গ্রন্থ ও বিচার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ধর্মবিষয়ে তর্কযুদ্ধে তিনি একজন বিপুল যোদ্ধা এবং এদেশে তাঁহার সমতুল্য আর কেহ নাই।"

বস্তুত রামমোহনের সমগ্র প্রতিভা তাঁহার ধর্মসংস্কারের চেষ্টায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রেমিক কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে। সকল ধর্মের সংস্কারই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। সেইজন্যই তিনি সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ম্যাক্স মূলারকে পর্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, তুলনামূলক ধর্মালোচনা এ যুগে রামমোহনই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মগুলির বিশেষভাবে আলোচনা রামমোহনই সর্বপ্রথম করিয়াছেন। ইহারই ফলে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মসভার পরিকল্পনা তাঁহার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিত। পরবর্তীকালে ব্রহ্মসভায় ইহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

এইবার পাদ্রীদিগের সহিত রামমোহনের সংঘর্ষের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় শ্রীরামপুরের জনৈক মিশনারি হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রের উপরে কটাক্ষ করিয়া 'হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহা ১৮২১, জুলাই মাসের কথা। লেখাটি রামমোহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখিলেন পাদ্রীসাহেব বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রকে ধূলিসাৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অমনি রামমোহন উহার একটি প্রতিবাদ ঐ পত্রিকাতেই পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদক উহা প্রকাশ করিলেন না। রামমোহন তখন গোঁড়া পাদ্রীদের চক্ষুশূল। রামমোহন নিরস্ত হইলেন না। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'

নাম দিয়া একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ইহা দ্বিভাষী মাসিক পত্রিকা ছিল। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজি অনুবাদ থাকিত। এই পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল চালাইবার প্রয়োজন হয় নাই, দ্বাদশ সংখ্যার পর রামমোহন উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার প্রথম সংখ্যার আলোচনার বিষয় ছিল 'ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ'। এ আলোচনার আরম্ভ এইরকম: "জগদীশ্বরায় নমঃ। শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।"

রামমোহনের এই উক্তি হইতে আমরা তিনটি মূল্যবান তথ্য পাইতেছি। প্রথম ১৮০০ সন হইতেই বাংলাদেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ Conversion-এর কাজে হাত দিতে আরম্ভ করেন; দ্বিতীয়, শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানদিগকেও ধর্মান্তর গ্রহণে প্রলুব্ধ করা হয়; তৃতীয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুগণকেই ধর্মান্তরগ্রহণে প্ররোচনা দেওয়া হইত এবং সাধারণত চাকরি দিবার প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক

তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করা হইত। বাংলা দেশ তখন ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিয়া গিয়াছে, ইংরেজের নামেই লোকের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এমন অবস্থায় রামমোহন দেখিতে পাইলেন দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ প্রবল দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শুধু দৌরাত্ম্য করা নয়, উপহাসও করিত; যেমন পূর্বকালে গ্রীক ও রোমানগণ ঈশ্বরপরায়ণ ইহুদীর ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত। এই সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাখানায় যে সব হিন্দুশাস্ত্র মুদ্রিত হইত তাহাতে 'তাবৎশাস্ত্রের অযুক্তিসিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি' প্রকাশিত হইত। রামমোহন ইহা দেখিয়া নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার দূরদৃষ্টি বলে অনুধাবন করিলেন যে, যদি ইহার প্রতিবাদ না করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে পাদ্রীদিগের এই সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের ফল বিষময় হইবে। শ্রীরামপুরের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, রাজার এই সংগ্রামে dignity ছিল, ক্ষুদ্রতা বা নীচতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি সংগ্রাম-কৌশল বুঝিতেন।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকায় তিনি ভারতবর্ষে মিশনারিদের ভূমিকার স্বরূপ তুলিয়া ধরেন। উচ্ছ্বাস বা আবেগের কথা কিম্বা রাগের কথা ছিল না একেবারে ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা রামমোহন তাঁহার বক্তব্যকে বিশদ করিয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে পাদ্রীদের প্রত্যেকটি উক্তি তিনি খণ্ড-বিখণ্ড করেন। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র রচনাগুলিতে রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র ও বাইবেলের উপর সমান পাণ্ডিত্য দেখিয়া পাদ্রীগণ বিস্মিত ও নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়া তাঁহারা কাজটা ভাল করেন নাই। অতঃপর রামমোহন ব্যাপটিস্ট মিশনারি এ্যাডাম ও ইয়েটস সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া প্রমাণ করিলেন কেরীর অনুবাদ কত নিকৃষ্ট। এই অনুবাদ উপলক্ষেই এ্যাডাম ও রামমোহনের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। এই এ্যাডাম সাহেবের নিকটে রামমোহন গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করেন। শিক্ষাকালে তিনি এ্যাডাম সাহেবের মন ত্রিতত্ত্ববাদ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একত্ববাদে লইয়া আসেন। এ্যাডাম নিজেই রামমোহনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া একেশ্বরবাদী হইলেন। সেদিন খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ বলিয়া

ছিলেন, "শয়তানের হাতে পড়িয়া বাইবেল-বর্ণিত আদমের যেমন পতন হইয়াছিল, সেইরূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া এ্যাডাম সাহেবের পতন হইয়াছে।" এ্যাডাম সাহেব শুধু একেশ্বরবাদই গ্রহণ করিলেন না। খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার জন্য একটি কমিটি পর্যন্ত গঠন করিলেন। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন সম্রান্ত বাঙালিকে লইয়া একটি ইউনিটেরিয়ান কমিটি গঠিত হইল। পিতা ও পুত্র—রামমোহন ও রাধাপ্রসাদ উভয়েই ইহার মধ্যে ছিলেন। এ্যাডাম সাহেব উপাসনার সময়ে আচার্যের কাজ করিতেন। রামমোহনের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাসে এই ইউনিটেরিয়ান কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সত্যানুসন্ধিৎসু রামমোহনের নিকট সত্যশিক্ষা সম্বন্ধে স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, স্বজাতীয় কি বিজাতীয়, কোনো বিচারই গ্রাহ্য হইত না। সত্যের উপর বিশেষ কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের যে কোনো লেবেল পড়িতে পারে না, ইহাই রামমোহন সেদিন সকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আজীবন তিনি সত্যের বন্ধু বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রামমোহন-চরিত্র আলোচনা করিবার সময় এই তথ্যটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। মার্শম্যান সাহেবকে পর্যন্ত রামমোহনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক তাঁহার বিচারপুস্তকগুলি য়ুরোপ ও আমেরিকার বিদগ্ধসমাজে রামমোহনকে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইংলণ্ডের লোকেরা ঐসব বই পড়িয়া একজন বাঙালির বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। রামমোহন যখন 'খ্রীষ্টের উপদেশ' পুস্তকখানি প্রকাশ করেন, তখন হিন্দুরা যেমন তাঁহার উদারতাকে ভুল বুঝিয়াছিল, তেমনি যাহাদের প্রভুর উপদেশ রামমোহন ছাপিলেন, তাহারাও তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ, রামমোহনের পুস্তকে যীশুখ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক বৃত্তান্তগুলি স্থান পায় নাই। সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মনকে তিনি এই অলৌকিকতার মোহ হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

রামমোহন যখন পাদ্রীদের এইভাবে পর্যুদস্ত করেন, তখন কলিকাতার উচ্চপদস্থ খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক বিশপ মিডলটন বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া রামমোহনকে খ্রীষ্টান করিতে চাহিলেন। "রামমোহনের ন্যায় একজন

প্রতিভাবান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিকে খ্রীষ্টধর্মে আনিতে পারিলে প্রচারকার্যের পক্ষে সুবিধা হইবে, প্রধানত এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই মিডলটন এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন, "তাঁহার বন্ধু উইলিয়ম এ্যাডাম একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। ঘটনাটি এই— "একদিন রামমোহন রায় জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরাহ্ণে হঠাৎ এ্যাডামের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ্যাডাম দেখিলেন, তাঁহার মুখে ভয়ানক উত্তেজনার চিহ্ন। দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। রামমোহন রায় বলিলেন, 'তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমার গায়ের উপরকার পরিচ্ছদ খুলি!' পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, 'জল! জল!'—ত্বরায় জল দেওয়া হইল। জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, 'আমার জীবনের সর্বপ্রধান আঘাত ও সর্বপ্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিডলটন আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড়ো হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে!' এ্যাডাম বলিয়াছেন, 'ইহার পরে রামমোহন আর মিডলটনের মুখ দর্শন করেন নাই'।"

রামমোহনের আত্মমর্যাদা কত গভীর ছিল তাহা তাঁহার জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে এই একটিমাত্র ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে। নবজাগরণের একটি বড়ো লক্ষণ এই আত্মমর্যাদাবোধ। সেদিন রামমোহনই ইহা আমাদিগকে প্রথম শিখাইয়াছেন।

কলিকাতায় আসিয়া এক বৎসর পরে রামমোহন তাঁহার মাণিকতলার বাড়িতে আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। এই আত্মীয় সভার মঞ্চ হইতেই তিনি নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি: আধ্যাত্মিক উন্নতি, জ্ঞান ও ধর্মপ্রচার এবং লোকমত গঠন। সপ্তাহে একদিন করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। রামমোহনের মতানুবর্তী বন্ধুগণ, যথা— দ্বারকানাথ ঠাকুর, নন্দকিশোর বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি হিন্দুসমাজের জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সেই অধিবেশনে যোগ দিতেন। ইঁহারাই প্রথমে প্রকাশ্যভাবে রামমোহনের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে,

আত্মীয় সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ ও অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। গোবিন্দমালা নামক একজন বেতনভুক গায়ক রামমোহন-রচিত ও অন্যান্য ধর্মসঙ্গীত গান করিতেন। এই আত্মীয় সভাই রামমোহনের ভবিষ্যৎ ধর্মসংস্কারের প্রথম সোপান ছিল।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব রাজার প্রিয় অনুযায়ী ছিলেন। একদিন তাঁহারা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, ধর্মোপদেশলাভের জন্য বিদেশীয়দের শরণাপন্ন হওয়া হীনমন্যতা। বেদাদি-ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা ও পরমার্থতত্ত্ব আলোচনার জন্য একটি সম্পূর্ণ দেশীয় সভা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবটি রামমোহনের মনঃপূত হইল। তারপর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে (কমল লোচন বসু। আসলে ইনি খ্রীষ্টান ছিলেন না ; পর্তুগীজ বণিকদের কাজ করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিত।) সকল ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি উপাসনাসমাজ স্থাপিত হয়। এ্যাডাম সাহেব রামমোহনের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিবার পর এইরূপ একটি উপাসনাসভার প্রয়োজনীয়তা রামমোহন অনুভব করেন। ইউনিটেরিয়ান সোসাইটিতে তখন তিনি তাঁহার শিষ্যদের লইয়া গিয়া উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের নিজস্ব একটি উপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, যখনই রামমোহন ইহা উপলব্ধি করিলেন তখনই তিনি ইহার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কার্যপদ্ধতিই ছিল এইরূপ ; কোনো কাজ ফেলিয়া রাখিতেন না। যাহা প্রয়োজন, ক্ষিপ্রতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতেন। এই উপাসনাসভার সম্পাদক হইয়াছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

কমল বসুর গৃহে এই উপাসনাসভা বেশি দিন থাকে নাই। এক বছর চার মাস পরেই, সংগৃহীত অর্থে কমল বসুর বাড়ির পার্শ্বেই একটি স্বতন্ত্র জমিতে নূতন বাড়িতে সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শনিবারের পরিবর্তে বুধবার উপাসনার দিন নির্দিষ্ট হয়। এই সমাজগৃহের রামমোহন নামকরণ করিলেন ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রহ্মসভা। ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের কথা। কলিকাতা শহরে অসাম্প্রদায়িক উপাসনার জন্য একটি মন্দির নির্মিত হইল। নামে মন্দির, আসলে ইহা একটি পাকা ইমারত। ঘটনাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার মতন। যে ব্রহ্মোপাসনা এতকাল ভারতবর্ষের ঋষিরা বা সাধু-মহাত্মারা

নির্জনে কিম্বা পর্বতশিখরে অর্থাৎ লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া করিতেন, সেই ঈশ্বর-উপাসনা আজ শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। আধ্যাত্মিক ভারতের শত শতাব্দীর ধারা আজ একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে রামমোহন ধর্মকে সহজ অথচ গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসনা-মন্দিরের 'ট্রাস্ট ডীড'-এর সার কথা এই যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এখানে মিলিত হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে। এইখান হইতেই ভারতের ধর্মজগতে নবযুগের সূত্রপাত। মাণিকতলার আত্মীয় সভার ইহাই ছিল সেদিনকার স্বাভাবিক পরিণতি।

আজ যখন আমরা কল্পনা করি যে, চারিদিকে হিন্দুসমাজের নির্যাতন ও নিন্দা রামমোহনকে নিগৃহীত করিয়া চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া যুগমানব স্বীয় কর্তব্য করিয়া চলিয়াছেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের একটি কথা আমাদের মনে পড়ে। মহর্ষি লিখিয়াছেন: "সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকটকাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন; কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন—কোন সহযোগী সঙ্গে আসুক আর নাই আসুক। শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন। যাইবার সময় গাড়ি করিয়া যাইতেন, এই একটি তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।"

রামমোহনের এক জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "সমাজ-দিবসে সূর্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্বে ইহার এক কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, সেথায় কেবল ব্রাহ্মণেরা যাইতে পারিতেন। তৎপর গৃহের যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, সে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করিতেন; তদনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেন। তৎপর ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত।"

এই সমাজ প্রতিষ্ঠার সময়ে রামমোহনের চিন্তায় একটি সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার

কল্পনাই ছিল। প্যারিসে কবি টমাস মুরের নিকট তিনি এই মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের 'ট্রাস্ট ডীড' বা অর্পণনামা দলিলেও আমরা এইরূপ একটি সর্বজনীন ধর্মের অভিপ্রায় ও ইঙ্গিত পাই। প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ করিব। এই 'ট্রাস্ট ডীড' বা উৎসর্গ-পত্র রামমোহনের প্রতিভার আর একটি নিদর্শন। সার্বভৌমিক ধর্মীয় আদর্শ বা Catholic Worship-এর ইহা একখানি অবিস্মরণীয় এবং অতি মূল্যবান দলিল। এই অর্পণনামা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন: "The Trust-Deed of the Somaj premises contains, we believe, the clearest exposition of Ram Mohan Roy's idea and will...This is the highest and the final expression of his religious nature." ইহার রচনায় রামমোহনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রামমোহনের একাধিক ইংরেজ চরিতকার ইহাকে বলিয়াছেন "এক অত্যাশ্চর্য ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ক দলিল—রামমোহনের জীবনব্রত বাণীরূপ লইয়া দেখা দিল"। বিশ্বমানবের উদ্দেশে রামমোহন সেদিন উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "যে কোনো ব্যক্তি ভদ্র ভাবে, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, এই সাধারণের মিলন-মন্দিরের দ্বার তাঁহারই জন্য উন্মুক্ত, তিনি যে দেশের যে জাতির বা যে ধর্মের লোকই হউন না কেন।" রামমোহনের 'ট্রাস্ট ডীডে' কোনো শাস্ত্রের উল্লেখ নাই এবং তাহা কোনো শাস্ত্রের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণ জ্ঞান ও নির্বিরোধ যুক্তিই তাহার ভিত্তিভূমি। উদার, অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ভাবই তাহার মর্মকথা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহা কি এক নূতন দিক্-পরিবর্তন নহে? একটি বিশ্বজনীন ধর্মের পরিকল্পনা পৃথিবীতে এই প্রথম। যদিও রামমোহন তাঁহার এই সমাজকে কোনো বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষণা করিয়া যান নাই, কিন্তু ইহাতেই এক বিশ্বজনীন নূতন ধর্মের বীজ নিহিত ছিল। বাংলার উর্বর মাটিতেই তিনি সে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডে গমনের প্রাক্কালে রামমোহন একাদশ বর্ষীয় বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেই বীজের উত্তরাধিকার দিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে রামমোহনের এই ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়াই এক বিরাট ও বহুমুখী আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল এবং সেই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই

ব্রাহ্মসমাজ তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা সিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্র।*

পরিশেষে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের সংগ্রাম ছিল দ্বিমুখী; একদিকে তিনি স্বজাতি ও স্বজনদের অন্ধ-সংস্কারের অচলায়তনে আঘাত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে বিদেশী ধর্মযাজকদের অকারণ কটাক্ষের বিরুদ্ধে স্বধর্মের সত্য মূল্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামমোহনের হাতেই বেদ দেখিয়া বাইবেলের অগ্রগতি মধ্যপথেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—পাদ্রীদের প্রচারকার্য তাঁহারই নিকট প্রথম প্রবল বাধা পাইয়াছিল। রামমোহনের এই দ্বিমুখী কর্মধারার মূলে ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের অসীম সত্যাসক্তি আর প্রচণ্ড স্বাভিমান। সত্যের প্রতি অটুট আস্থা লইয়া তিনি জাতির জীবনে মিথ্যার জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া-ছিলেন; অন্যদিকে প্রবল স্বাভিমান ও স্বজাতিপ্রীতিবশে পাদ্রীদের অন্যায় নিন্দা-চেষ্টার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আরো একটা বলিষ্ঠ উপাদান তাঁহার তীব্র মানবপ্রেম। মানুষ তাহার নিকটে ঈশ্বরের সন্তান এবং সেই কারণেই মানবপ্রেম ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধ্য। রামমোহনের ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ইহাই তাৎপর্য। রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলন আন্দোলন নয়, বিপ্লব।

* লেখকের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' ও 'কেশবচন্দ্র' দ্রষ্টব্য

॥ নয় ॥

রামমোহন যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন তিনটি সভ্যতার সংঘাতের ভিতর দিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন সবেমাত্র গড়িয়া উঠিতেছে। একদিকে ইসলাম, অন্যদিকে হিন্দু ও নবাগত খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে একটি সংঘর্ষ চলিয়াছে। নূতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়া যাঁহারা বাংলার সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নবীন দলের নায়ক হিসাবে কলিকাতা তথা বাংলার সমাজ-জীবনে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত (অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষিত) বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন: দ্বারকানাথ ঠাকুর (কলিকাতা সমাজে ইনি তখন 'প্রিন্স' নামে পরিচিত), তাঁহার ভাই রমানাথ ঠাকুর, খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল, গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর, লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সির দেওয়ান রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র ব্রজমোহন মজুমদার, নন্দকিশোর বসু (স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর পিতা), তারাচাঁদ চক্রবর্তী, টাকির কালীনাথ মুন্সী, বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী, জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহ, ভূ-কৈলাসের কালীশঙ্কর ঘোষাল, তেলিনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ সুখময় রায়ের পুত্র বৈদ্যনাথ রায়, বড়বাজারের ধনকুবের কাশীনাথ মল্লিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা পীতাম্বর মিত্র, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের রাজার আত্মীয় মতিচাঁদ, মথুরানাথ মাল প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নবাবী আমলে উচ্চপদে কর্ম করিয়া বিত্তবান হন এবং পরে কোম্পানীর আমলে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি পদে থাকিয়া প্রচুর টাকা করেন। ইঁহারা সকলেই রামমোহনের অনুগামী ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিবার পর রামমোহন ক্রমে ক্রমে ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন ও এইভাবে প্রায় পাঁচশত অনুগামী তাঁহার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্যে প্রধান সহায়ক হইয়া উঠিলেন। এইরূপ একটি শক্তিশালী ও অনুরক্ত গোষ্ঠী পাওয়াতে রামমোহনের সংস্কার-আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। ইঁহাদের লইয়াই রামমোহন তাঁহার মাণিকতলার বাড়িতে নূতন যুগের পত্তন করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক রামমোহনের মাণিকতলার সেই বাড়িতে সেদিন নবযুগ গঠনের এক বিরাট যজ্ঞশালা বসিয়াছিল। তমসাবৃত সেই যুগে ভারতের মহাশ্মশানে বসিয়া এই মহাকৌল যে বিরাট ও বহুমুখী সাধনার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করে নাই। রামমোহনের কোনো বস্‌ওয়েল ছিল না। যদি থাকিত, তাহা হইলে এই বিরাট প্রতিভা নানা কার্যের ভিতর দিয়া কি ভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল এবং কি ভাবে ঘুমন্ত জাতির ঘুম ভাঙাইয়া দিয়াছিল, তাহা আমরা আরো বিস্তারিতভাবে জানিতে পারিতাম। তাই রামমোহনের সম্পূর্ণ জীবনচরিত, তাঁহার কর্মজীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস আজো লিখিত হয় নাই। সেই যজ্ঞশালায় তিনি একাই ছিলেন হোতা, উদ্গাতা এবং ঋত্বিক। 'নমো ধর্মায় মহতে' আর 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' এই বলিয়া সেই যজ্ঞে তিনি যখন দিনের পর দিন আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, শতাব্দীর সঞ্চিত যত উপধর্ম আর কুসংস্কার ও লোকাচারের স্তূপ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সেই যজ্ঞীয় হুতাশনের আভায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিগন্ত যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। একটি মস্তিষ্ক হইতে প্রতিক্ষণ গঠনমূলক চিন্তার বিদ্যুৎপ্রবাহ উত্থিত হইয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিস্তার করিয়া বাংলার মৃতপ্রায় সমাজ-জীবনের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, কর্মের আবর্ত রচনা করিতেছে, সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে; একটি মানুষ প্রতিদিন নিরলসভাবে সকলের সহিত ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন, বিচার-বিতর্ক করিতেছেন, সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতেছেন; আবার সেই একই মানুষ রাজপুরুষদের সহিত দেশের শাসনকার্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, শিক্ষার কথা ভাবিতেছেন, অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবিতেছেন এবং সেই একই মানুষ ভারতবর্ষের বাহিরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোথায় কি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিতেছে তাহার বিবরণও সাগ্রহে পাঠ করিতেছেন। বাইবেল, বেদ-বেদান্ত ও তন্ত্রের সহিত একই আসনে বসিয়া আছেন বেকন, ভলটেয়ার, ভল্‌নি ও সিসেরো। সে এক আশ্চর্য যজ্ঞশালা। মানবহিতবাদের মন্ত্রে মুখরিত আর নগর-সভ্যতার কেন্দ্রে সংস্থাপিত সেই যজ্ঞশালায় ধর্মের সহিত জ্ঞান ও কর্মের সাধনা পাশাপাশি চলিয়াছে। জাতির সর্বাত্মক জাগরণই ছিল সেই যজ্ঞের কাম্য।

দেখিতে দেখিতে বাংলার সমাজ-জীবন কলরবমুখর হইয়া উঠিল।

রামমোহনের ধর্মসংস্কার-আন্দোলন অচিরকালের মধ্যেই সমাজ-জীবনে গভীর ও দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিল। ইহার প্রথম আঘাতেই বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করিয়া বাংলা গদ্যভাষা, এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দিল। এবং সেই সঙ্গে বাংলার হিন্দুসমাজও প্রবল তরঙ্গের আঘাতে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিল। এইবার রামমোহন সমাজসংস্কারের দিকে মন দিলেন। তিনি জানিতেন, সমাজ একটি জীবন্ত সত্তা (a living organism)। ইহার এক অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুতরাং ধর্মের সংস্কার শিকায় তুলিয়া রাখিয়া সমাজসংস্কার সম্ভব নয়, আবার সমাজসংস্কার উপেক্ষা করিয়া রাষ্ট্রের সংস্কার সম্ভব নয়। রামমোহনের কার্যপন্থার ধারা অনুসরণ করিলে উহার মৌলিকতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। প্রথমে তিনি ধর্মসংস্কারে হাত দিলেন, তারপর সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সাহিত্য ও ভাষার সংস্কারসাধন ইহারই সহিত সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। ইহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে তিনি কত বড়ো একজন সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জানিতেন, নিকৃষ্ট ধর্মব্যবস্থার সহিত উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থার কোনো সামঞ্জস্য হইতে পারে না।

রামমোহনের সমাজসংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-নির্মাণে তাঁহার প্রয়াসের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র।"

রামমোহনের অন্যতম জীবনচরিতকার কিশোরীচাঁদ মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

"Rammohan Roy's Bengali was truly classical. All his vernacular writings are pre-eminently characterised by chastity of diction, a sauvity of style and a felicity of illustration, not to be met with in the writings of older Bengali writers." সুতরাং রামমোহনকে আমরা নিঃসন্দেহে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

নবীন বাঙালিজীবনের নব-সংস্কৃত রূপের স্বপ্নদ্রষ্টারূপেই জীবনশিল্পী রামমোহন ভাষাকে নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, মাতৃভাষার উন্নতির উপর একটা জাতির মানসিক উন্নতি ও অন্য অনেক বিষয়ের উন্নতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। রামমোহনের পূর্বে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি কোনো বিষয়ই লিখিত বাংলা ভাষায় আলোচিত হইত না। রামমোহন কোনো কোনো বিষয়ে অনুবাদ ও মৌলিক রচনা দ্বারা, প্রবন্ধ লিখিয়া ও সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভাষায় কথাবার্তা প্রচলিত ছিল, সেই বাংলা ভাষাকে রামমোহন স্বীয় প্রতিভাবলে সাহিত্যের রূপ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই ধর্ম ও সমাজসংস্কার-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বাংলা গদ্য একটা বিশেষ রূপ লইয়া আমাদের সম্মুখে প্রথম দেখা দিল। দেশীয় লোকদের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উন্নতির জন্যও রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে যে কয়খানি সাময়িক পত্র ইহার বিকাশে সহায়তা করিয়াছিল, রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' নিঃসন্দেহে তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাহিত্যগঠনের প্রথম পথপ্রদর্শক রামমোহন।

রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে ভাষা-রচনায় ব্রতী ছিলেন না, ধর্ম ও সমাজই ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু তাঁহার ছিল জীবনসত্য-বোধ এবং প্রবল ব্যক্তিত্ব। সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি বজ্রকণ্ঠে সেই সত্যবাণীর বিঘোষণ করিয়াছিলেন, জীবনপণ করিয়াছিলেন তাহার বাস্তব প্রতিষ্ঠার

জন্য। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অঙ্গাঙ্গি জড়াইয়া ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা। এই দুইটি জিনিস মিলিয়া তাঁহার ভাষাকে দিয়াছিল এক বলিষ্ঠ স্বকীয়তা।

বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনের নানা ক্ষেত্রে সংস্কারসাধনের জন্য বাঙালির ভাষাকেই রামমোহন মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাষা তখন দুর্বল, ফোর্টউইলিয়ম যুগের দুই-একজন পণ্ডিতের প্রতিভাচিহ্নিত হইলেও বিশৃঙ্খল। কি করিয়া বাংলা ভাষা পড়িতে হয়, কি করিয়া সে ভাষা হইতে অর্থ আহরণ করিতে হয় সে সম্বন্ধেও সাধারণ পাঠক ছিল অজ্ঞ। তাই 'বেদান্ত গ্রন্থে'র 'অনুষ্ঠান' অংশে রামমোহনকে লিখিতে হইল: "প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতকগুলি শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ উহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি।"

রামমোহনের নিজের কথাতেই এখানে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য-সীমাকে তাহা অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই, রামমোহনকে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য বাচ্য ভাষার অন্বয় নির্দেশ করিতে হইয়াছে। পাঠ্যেতর ভাষার উদ্দেশ্য এবং ব্যবহারবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রামমোহন এখানে সচেতন। বলা বাহুল্য, সাধারণ পাঠ্যপুস্তকও তিনি একাধিক রচনা করিয়াছেন; কিন্তু সেখানে উদ্দেশ্যের এই স্পষ্টতা এবং ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক সংযোগসাধন অপরিহার্য ছিল না। ফলে, সে-ভাষা অনায়াসপাঠ্য হইলেও, রামমোহনের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গীর স্পর্শ সেখানে নাই। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর আরম্ভ হইয়াছে,—"ব্যাকরণ তাহাকে বলা যায় যাহার জ্ঞান দ্বারা উচ্চারণ শুদ্ধি, লিপি শুদ্ধি,

অর্থাৎ যথাযোগ্য স্থানে পদবিন্যাসের ক্ষমতা হয়…ব্যাকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, এক বর্ণ দ্বিতীয় পদ।"

কিন্তু 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'-এর ভূমিকায় একই রামমোহন লিখিতেছেন: "মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলন দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টচার্য একবার প্রবর্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না, অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম।"

অথবা, 'বেদান্ত গ্রন্থে' রামমোহন লিখিয়াছেন—"এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের উর্ধ্বগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে যান, তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্বার জীব আইসেন, এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয়।"

'বেদান্ত গ্রন্থে'র সূচনায় ভাষার অন্বয় সম্বন্ধে রামমোহন অতি অবহিত হইয়াছেন। অথচ, উপরে উদ্ধৃত শেষ রচনা দুইটির কোনটিতেই সেই অন্বয়ের বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই। অন্যদিকে পাঠ্য ব্যাকরণের ভাষায় কিন্তু তাহা আছে। তা'ছাড়া, এ ভাষায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর তুলনায় প্রাঞ্জলতারও অভাব; মাধুর্যের ত কথাই নাই। তথাপি ইহা যে বিচারসমৃদ্ধ ভাষা—রমেশচন্দ্র দত্ত যাহাকে বলিয়াছেন,—'well reasoned'—তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন বেদান্তশাস্ত্রের যান্ত্রিক অনুবাদক মাত্র ছিলেন না, তাঁহার ছিল একটি বিশুদ্ধ বৈদান্তিক মন। ভাষায় যতই দুর্বল ও অ-পূর্ণগঠিত হউক, সেই মনের দীপ্তি বিচারবত্তার ক্ষুরধার-সহ শেষের উদ্ধৃত রচনা দুইটিতে প্রকাশ পাইয়াছে, লেখকের বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে। ইহাই রামমোহনের ব্যক্তিত্ব-স্পৃষ্ট নিজস্ব লিখনভঙ্গী। সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে এইখানেই বাংলা গদ্যের নবজন্ম, যদিও সাহিত্য-বিষয়ক রচনা রামমোহন একটিও লিখেন নাই। রামমোহনের সমাজসংস্কার, তথা সহমরণ-নিবারণার্থ রচনাবলীর মধ্যেও যুক্তি ও চিন্তার—তাঁহার বৈদান্তিক মনের এই প্রাখর্য স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান।

বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের স্থান নির্দেশ করিতে গিয়া প্রমথ চৌধুরী লিখিয়াছেন: "রামমোহন রায় বাংলা ভাষার শুধু প্রথম গদ্য লেখক নন; গদ্য রচনার প্রকরণপদ্ধতি বিধি-নিষেধও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ও তার বাক্যগঠন প্রণালীও যে বিভিন্ন, এ বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথমে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কি-পদ্ধতি অনুসারে বাংলায় বাক্য গঠন করতে হয়, তার নিয়মাবলীর প্রতিষ্ঠা রামমোহনই প্রথম করেছেন।" অতএব এই দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে রামমোহনকেই বাংলা গদ্যের জন্মদাতা বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

বস্তুত জাতির মনন ও স্বাধীন চিন্তাকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে রামমোহনের বিচারবিতর্কমূলক রচনাগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে রামমোহনের পূর্বে এই জাতীয় প্রবন্ধ আর কেহ রচনা করেন নাই। বাংলা গদ্যের গঠনের যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তাও ছিল। রামমোহন ভিন্ন সে যুগে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আর কাহারও রচনায় ছিল না। তারপর রামমোহনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বাংলা সাহিত্যে আর একটি নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছিল। ইহারই চরম ও সার্থকতম পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের গানে।

কালের হাতে রামমোহনই ছিলেন অব্যবহিত পরবর্তী যুগে অভ্যুদিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মুক্তিদূত। বাংলা গদ্যে ব্যক্তিত্বস্পর্শ ঘটিয়াছিল প্রথম রামমোহনের হাতে; রামমোহনের রচনায় প্রথম দেখিয়াছি বিচারমূলক জীবনজিজ্ঞাসা, বিপ্লবাত্মক আত্মসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। রামমোহনের লেখায় সামাজিক জাগরণের বার্তা ধ্বনিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার রচনাবলীর সার্থকতা ইহাই।

॥ দশ ॥

সমাজসংস্কারক রামমোহনের কথা বলিতে গিয়া স্বামী বিবেকান্দ, (যিনি রামমোহনের সমাজসংস্কার সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন) বলিয়াছেন : "সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজ স্থাপন করেন। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি নিজের জন্য কোনোরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেন না।"

হিন্দুসমাজে প্রচলিত এই পাঁচটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিচারের দুধারি তরবার-হস্তে রামমোহন সংগ্রাম করিয়াছিলেন : (১) জাতিভেদ, (২) অস্পৃশ্যতা, (৩) বহুবিবাহ, (৪) বাল্যবিবাহ এবং (৫) সতীদাহ। ইহার মধ্যে শেষেরটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি এবং বাংলার পরবর্তী কালের সমাজবিপ্লবের ইতিহাসে ইহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করি। সেইদিন হইতে যে-ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল বহু দূরে প্রসারিত হইয়াও সে-ঝড় থামে নাই। ইতিহাসের ঝড় থামে না।

আধুনিক বাংলায় নবজাগরণের মুক্তিপথ প্রথম আলোকিত হইল উনিশ শতকে। সে পথের প্রথম আলোকস্তম্ভ প্রথম ইংরেজি-পণ্ডিত বাঙালি রামমোহন রায়। উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁর সার্থকতার উৎস প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রভাবে প্রমুক্তচিত্ত সামাজিক সাধারণ কর্তৃক ভারতীয় জীবনাদর্শের পুনর্মূল্যায়নে। রামমোহন রায়ের মধ্যে এই চেষ্টার সূচনা। রামমোহন এই দেশের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই পরিবেশের মধ্যেই পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের সেই জীর্ণ খোলস তাঁহার নিকট দুঃসহ হইয়াছিল। রামমোহন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। রামমোহন হিন্দু জ্ঞান-মনীষার প্রতি প্রথমে সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেন নাই। পরে যখন তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত অনুশীলন করিলেন, তখন

হইতেই রামমোহনের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ্য জ্ঞানসাধনার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করি। শুধু স্বীকৃতি নয়, প্রকাশও। কলিকাতা বাসের পূর্বে রংপুরে ডিগবির সাহচর্যে ইংরেজি জ্ঞানালোকের স্পর্শও তিনি নিবিড়ভাবে পাইয়াছেন। সুতরাং এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে যুগপৎ ইংরেজি ও দেশীয় শিক্ষার সম্মিলিত প্রভাবই সংস্কারক রামমোহনের স্বভাবকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। রামমোহনের সমাজবিপ্লবী সত্তার মর্মমূলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও মানবিক সহৃদয়তাও লক্ষণীয়।

মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলার জীবনধারা সমাজপ্রধান। আর সে সমাজ ছিল পরিবারানুগ। ব্যক্তির জীবন সেখানে একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত সমষ্টিগত ও সামাজিক কল্যাণবোধের আদর্শ দ্বারা। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রশ্নমাত্র সেখানে উঠে নাই, একটি সমগ্র সমাজ সে যুগে সক্রিয় মূর্তিমান হইয়াছিল প্রতিটি সামাজিকের অন্তরচেতনায়। জীবনের সংকীর্ণতর পরিবেশে সে যুগের বাঙালি সেই সামাজিক মূল্যবোধেরই প্রাথমিক সংহত চর্যা করিয়াছে যৌথপরিবার প্রথার পটভূমিতে। নানা প্রকার গভীর-অগভীর আত্মীয়-সম্পর্কে-বাঁধা এক-একটি জনসমষ্টিকে লইয়া ছিল সেকালের বৃহদায়তন এক-একটি যৌথপরিবার। সকলেই এক বৃহৎ পারিবারিক ঐতিহ্যের ভারবাহী মাত্র ছিল, সেই ঐতিহ্য রক্ষার নামে সহিয়া যাওয়া ও মানিয়া চলাই ছিল প্রতিটি পারিবারিকের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রশ্ন করা, জবাব-দিহির দাবি করা, সেকালের জীবনমূল্যবোধের নিকট ছিল অপরাধজনক অনধিকারচর্চা মাত্র। এই ব্যক্তিত্ব-সচেতনতাহীন সমষ্টিকল্যাণবোধের আদর্শই অন্ধতা প্রাপ্ত হইয়া একদিন বাঙালির অস্থি-মজ্জায় কুসংস্কারের মহীরুহ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন সেই সামাজিক কুসংস্কারের অচলায়তনে প্রথম কুঠারাঘাত করেন। এইখানেই নবীন বাংলার সমাজবিপ্লবের আরম্ভ। পিতামাতা ও পরিবারের প্রতি রামমোহনের বিমুখতা ও বিরোধের পশ্চাতে মতান্তর ও মনান্তর থাকিলেও, আসলে তাঁহার ব্যক্তি-সচেতন আত্মমর্যাদাবোধ এখানে আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে।

আরো একটি কথা। ডিরোজিওর বহু পূর্বে রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা দেশে শাস্ত্রজ্ঞান তথা ঈশ্বর-স্বরূপকে বিচারপ্রামাণ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অর্থাৎ সর্বপ্রকার পূর্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি। মানুষ হইবে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপর একান্ত নির্ভর—প্রতিটি বিষয়কে সে যুক্তিসিদ্ধ করিয়া লইবে, তবেই ত জাতির সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিপ্লবী-চেতনা জাগিবে; ইহাই ছিল সে দিন রামমোহনের শিক্ষা। ব্যক্তিত্বের এই সর্বনিরপেক্ষ একক প্রাধান্যের আদর্শই মানববাদ (Humanism) নামে সে দিন অভিহিত হইয়াছিল। এই আপোষহীন ব্যক্তিত্ব-সর্বস্বতার প্রথম এবং প্রবলতম উদ্গাতা বিপ্লবী রামমোহন। নিজের ব্যবহারিক জীবনে মানবাত্মার নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় একদিকে তিনি 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অন্যদিকে পিতামাতার মত পরমাত্মীয়ের প্রতিও প্রকাশ করিয়াছেন অবিমিশ্র বিরূপতা। সমাজকেন্দ্রিক পরিবারে রামমোহনের জন্ম, আর সামাজিক ঐতিহ্যবোধের উপরে প্রবল আঘাতই রামমোহনের ব্যক্তিজীবনে চরমতম রূপ ধারণ করিয়াছিল। সমাজসংস্কারক রামমোহনকে বুঝিতে হইলে, সর্বাগ্রে তাঁহার বিপ্লবীচেতনার এই পটভূমির সহিত আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়াছি পরিব্রাজক-জীবনে রামমোহন. সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটি স্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে নারীর অবস্থা কী শোচনীয়, তাহাও দেখিয়াছেন। হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছেন ভারতে নারীজাতির কী অসহায় অবস্থা। পরিবার কি বৃহত্তর সমাজ-জীবনে নারীর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই। স্বামীর চিতার উপরেই তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত না, সমগ্র জীবনই তাহাকে পুরুষপ্রধান সমাজের অত্যাচারে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতে হইত। বহুবিধ প্রথার গুরুভার পাষাণের তলায় তাহাকে আজীবন পিষ্ট হইতে হইত। ভারতের জীবন্মৃতা নারীদের দুঃখবিমোচনেই রামমোহন তাই প্রথমে অগ্রসর হইলেন। তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। রামমোহন কখনো আবেগ বা উচ্ছ্বাসের বাষ্পাবেগ দ্বারা পরিচালিত হইতেন না। সমস্যাটি সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন এবং বুঝিয়া কোন্ পথে ইহার সমাধান, তাহা ধীরভাবে চিন্তা

করিতেন। তারপর নামিতেন কর্মক্ষেত্রে। একবার নামিয়া শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া নিরস্ত হইতেন না। ইহার জন্য অর্থব্যয়, পরিশ্রম, উপহাস বা নিন্দা কিছুই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ইহাই তাঁহাকে তাঁহার যাবতীয় সংস্কার-প্রচেষ্টায় সফলতা আনিয়া দিয়াছিল।

সমাজবিপ্লবী রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সমাজসংস্কারক আর সতীদাহ-নিবারণ আন্দোলনই এই দেশে প্রথম সংস্কার-আন্দোলন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন। 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বিশেষণটি ব্যবহার করিতেছি এই কারণে যে এই একটিমাত্র আন্দোলনই পরবর্তী অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংস্কার-আন্দোলনের জন্ম দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়। রাজার এই আন্দোলনের ফলেই সমগ্র ভারতবাসী কালক্রমে সমাজ-সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। 'রামমোহন' নামটির সহিত 'সতীদাহ-নিবারণ' কথাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, যেমন পরবর্তীকালে 'বিদ্যাসাগর' নামটির সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল 'বিধবাবিবাহ' কথাটি। এই দুইটি সংস্কার-প্রয়াসের ফলে উভয়েই হিন্দুসমাজের নিকট ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। অথচ সেই হিন্দুসমাজই এই দুইটি আন্দোলন দ্বারা সমধিক উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু উপকারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই। বিষয়টির একটু সুবিস্তৃত আলোচনাই করিব।

সতীদাহ, অর্থাৎ মৃত পতির সহিত বিধবা পত্নীকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া মারিবার প্রথা এই দেশে সুপ্রাচীন। রামমোহন এই বর্বর প্রথাটির বিরুদ্ধে প্রথম কুঠারাঘাত করিতে চাহিলেন। বস্তুত তাঁহার ধর্মসংস্কার ও সতীদাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন, এই দুইটি প্রচেষ্টার লক্ষ্য এক—যুক্তিবিরুদ্ধ সংস্কার বিদূরিত করিয়া হিন্দুর চিত্তশুদ্ধির সম্পাদন। সতীদাহ-প্রথাটি আসলে প্রথাই, উহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই। ইংরেজ যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে তখন এদেশে নানা প্রকার আত্মবলি ও নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। লোকে দেবতার স্থানে ধর্না দিত, গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ করিত, গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন করিত, বিধবাকে স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় জীবন্ত অবস্থায় পুড়াইয়া মারিত, আবার কোনো কোনো অঞ্চলে

স্ত্রীকে স্বামীর শবের সহিত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। এইসব প্রথার পিছনে প্রকৃত শাস্ত্রের কোনো সমর্থন থাকিত না, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদের বিধানই ইহাদের নিয়ামক ছিল। এইসব অনাচার হিন্দুর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও ইহাদিগকে প্রকৃত হিন্দুসভ্যতার অঙ্গ বলা যাইতে পারে না; কেননা, হিন্দুর প্রামাণ্য শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের বচনে ইহাদের বিধি নাই। সকল দেশেই সভ্যতার পশ্চাতে একটি বর্বরতার ছায়া থাকে। য়ুরোপে witchcraft বা ডাইনীদিগকে পুড়াইয়া মারা বহু প্রাচীন প্রথা। সমাজবিজ্ঞানীরা সভ্যতার সঙ্গে বিজড়িত বর্বরতার অবশিষ্টকে লোকশাস্ত্র বলিয়াছেন। পুত্রবিসর্জনের মত প্রথা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। এইগুলি দেশাচার, লোকাচার বা স্থলবিশেষে কুলাচারমূলক।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়ার দিকের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরকার আইন করিয়া এই সকল অনাচার রহিত করিয়া দিতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই জাতীয় তিনটি আইন পাশ হইয়াছিল এবং এই আইন পাশ হইবার ফলে ধর্না ও গঙ্গাসাগরে অথবা গঙ্গায় পুত্রবিসর্জন দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। এইসব অনাচার নিবারণ করিবার জন্য তখন আইনের প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু সেই আইনের দ্বারা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হিন্দুধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ধর্মে হস্তক্ষেপের প্রশ্ন সর্বপ্রথম উঠিল সতীদাহ-নিবারণের সময়ে। যে সকল স্মৃতিনিবন্ধ অনুসারে সেকালের আদালতের পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিতেন, সেই সকল নিবন্ধে স্ত্রীর মৃত পতির অনুগমনের বা সতীদাহের বিধান ছিল। সুতরাং সতীদাহ নিবারণ করা কর্তব্য কি না, এ বিষয়ে ইংরেজ রাজপুরুষগণের বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দিল্লীর সিংহাসনে যখন খিলজি-বংশীয় সম্রাটগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন একবার সতীদাহ দমনের চেষ্টা হইয়াছিল। তারপর সম্রাট আকবর বিশেষভাবে এই প্রথা নিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ইহার পর আসিল কোম্পানীর আমল। বাংলা-বিহারের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত সরকার কলিকাতা শহরের বাহিরে সতীদাহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। সুপ্রীম কোর্ট তখন কলিকাতা শহরের

সতীদাহ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার অধিবাসীরা শহরের বাহিরে গিয়া সতীদাহ সম্পাদন করিত। এই ভাবেই বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল। তারপর গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত একখানি চিঠিতে নিজামত আদালতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরূপ সহমরণ হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। তখন নিজামত আদালতে বেতনভোগী বহু পণ্ডিত ছিলেন। এই চিঠির উত্তরে নিজামত আদালতের জজেরা উক্ত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়া ঐ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে উত্তর দিয়াছিলেন : "গর্ভবতী, ঋতুমতী, নাবালিকা, বা শিশুসন্তানবতী বিধবার সহমরণ শাস্ত্রসম্মত নহে, এবং মাদকদ্রব্য খাওয়াইয়া কোনো বিধবাকে সহমরণে ব্রতী করাও কর্তব্য নহে।" ইহার অনতিকাল পরেই ওয়েলেসলি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে পারেন নাই। মোটের উপর, সতীদাহ-প্রথা হিন্দুধর্মানুমোদিত—নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণ এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যাস-বৃহস্পতি-অঙ্গিরা প্রভৃতি মহামুনিগণের দোহাই দিয়া এবং 'সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বামীর সহিত স্বর্গবাস'-এর নজির প্রদর্শন করিয়া সহমরণ-প্রথাটি সমর্থন করেন। ইহার পর আসিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। তাঁহার সময়ে সতীদাহ বিষয়ে কোনো কিছু হয় নাই, পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল বার্লোর সময়েও বিশেষ কিছু হয় নাই। ওয়েলেসলি চলিয়া যাইবার পর, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আবার বিষয়টি আলোচনা করিতে থাকেন। এইবার প্রশ্ন উঠিল : "সতীদাহ-প্রথা হিন্দুধর্মসম্মত হইলেও হিন্দুজাতির ধর্মের উপরে গুরুতর আঘাত না করিয়া উহা শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কি না?" আবার অনুসন্ধান চলিল। সরকারী বিবরণে প্রকাশ যে, 'সকল বর্ণের হিন্দুগণ সতীদাহ প্রচলিত রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন'। নূতন শাসক আর অধিক অগ্রসর হইলেন না। কোম্পানী হিন্দুধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিলেন। তবে ১৮১৫ এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকার নিজামত আদালতের উপদেশ মত ম্যাজিস্ট্রেটগণের উপর আদেশপত্র পাঠাইয়া কোনো কোনো বিধবার সহমরণ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন হিন্দু এই সকল আদেশপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন।

ঠিক এই সময়ে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়া রামমোহন অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে উক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে অন্যান্য হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে একটি পাণ্টা আবেদন প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে হেষ্টিংসের আমলে সতীদাহ সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ঐ তথ্য সাধারণের নিকট তখনো প্রকাশ করেন নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ও কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের সভায় তখন সতীদাহ বিষয়টি লইয়া সবেমাত্র আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ তখন সতীদাহের বিষয়টি জানিতে পারিয়াছে। তাহারা এই নৃশংস প্রথা উঠাইয়া দিবার কথাও চিন্তা করিল এবং ইহাদেরই চাপে সরকারী তথ্যগুলি পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাণ্টা আবেদনের ব্যবস্থা করিয়া রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁহার 'সহমরণ বিষয়' প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। হিন্দুশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী রামমোহন কেন যে সতীদাহ নিবারণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, এই পুস্তিকার নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি উপস্থাপিত করিলেন :

"প্রবর্ত্তকের প্রশ্ন : আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি যে তোমরা সহমরণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস করিতেছ।

নিবর্ত্তকের উত্তর : সর্বশাস্ত্রেতে এবং সর্বজাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাঁহারাই আশ্চর্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।"

এই উত্তর শুনিয়া প্রবর্তক সতীদাহের অনুকূল শাস্ত্র সকল উল্লেখ করিলেন। প্রত্যুত্তরে বিবর্তক বলিলেন :

"এ সকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে এবং এ সকল বচনের দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক যদি সহমরণ ও অনুমরণ করে তবে তাহার বহুকাল ব্যাপিয়া স্বর্গ ভোগ হয় কিন্তু বিধবাধর্মে মনু প্রভৃতি যাহা

কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর।... ইহাতে মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন। অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন, 'যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ভৈষজং'। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি—'মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে'।—মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে। বিশেষত বেদে কহিতেছেন—'তস্মাদু হ ন পুরায়ুষঃ স্বঃকামী প্রেয়াদিতি'।

"যেহেতু জীবন থাকিলে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ুসত্ত্বে আয়ুর্ব্যয় করিবেক না অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি আপন আপন স্মৃতিতে বিধবার প্রতি ব্রহ্মচর্যধর্মই কেবল লিখিয়াছেন এই নিমিত্ত এই স্মৃতি ও মন্বাদি স্মৃতি দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পষ্ট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক পতির কাল হইলে পর ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মোক্ষসাধন করিবেন।"

এই প্রথম পুস্তিকার উপসংহারে রামমোহন সতীদাহের বিধান-দাতাদের ধিক্কার দিয়া বলিলেন: "যাহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন তাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই"। সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল এক বৎসরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮১৯-এর নভেম্বর মাসে। রামমোহনের প্রথম পুস্তিকার প্রতিবাদ করিয়া কাশীনাথ তর্কবাগীশ নামক জনৈক পণ্ডিত রাধাকান্ত দেবের প্ররোচনায় 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারই প্রত্যুত্তরে রামমোহন দ্বিতীয় পুস্তকখানি রচনা করেন। এই দ্বিতীয় পুস্তকের যে সকল প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়' তৃতীয় পুস্তিকায় রামমোহন তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

সতীদাহ নিবারণ করা উচিত কি না এই সম্পর্কে সরকারী নথিপত্রে বিস্তর

আলোচনা থাকিলেও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কার্যত নিশ্চেষ্ট ছিলেন। লর্ড আমহার্স্ট তখন গভর্ণর-জেনারেল। তাঁহার একটি ডেসপ্যাচে (১৮২৮, ৪ঠা জানুয়ারি) দেখিতে পাইতেছি :

"The report of our different officers do not appear to me to point out any specific course, short of absolute prohibition by which this barbarous practice could be suddenly checked or the number of victims very considerably reduced. But I think there is reason to believe and expect that, except on the occurrence of some very general sickness such as that which prevailed in the lower parts of Bengal in 1825, the progress of general instruction and the unostentatious exertions of our local officers will produce the happy effect of gradual diminution and at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of *Sati.*"

লর্ড আমহার্স্ট সাক্ষাৎভাবে সতীদাহ নিষেধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার ভরসা ছিল শিক্ষার বিস্তারের ফলে এবং সরকারী কর্মচারিগণের আড়ম্বরশূন্য চেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এই নৃশংস প্রথা লুপ্ত হইবে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইবার চার বৎসর পরে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই সম্পর্কে একটি পুলিশ রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। দেখা গেল, এক বৎসরের মধ্যে এক কলিকাতা-সীমার মধ্যে ৩৪০ জন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছে এবং ইহাদের বয়স ২৬ হইতে ৬২ বৎসরের মধ্যে। রামমোহন সেই রিপোর্ট পড়িলেন। যৌবনকালেই তিনি কোনো স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যাপারে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত না উক্ত প্রথা রহিত হয়, ততদিন তিনি তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা রামমোহন কখনো বিস্মৃত হন নাই। কথিত আছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ অলকমঞ্জরী সহমৃতা হইয়াছিলেন। অলকমঞ্জরীর বয়স তখন চল্লিশ বৎসর। ইহা ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। রামমোহন তখন রংপুরে। বাড়ি হইতে যখন

তাঁহার নিকট এই সংবাদ গিয়া পৌঁছিল, তিনি মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন। নিজের পরিবারেই এই কাণ্ড! আর এই যুগে! সতীদাহ নিবারণের প্রশ্ন তাঁহার মনে সেদিন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাড়ি আসিয়া যখন শুনিলেন তারিণী দেবী এই মর্মান্তিক সহমরণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন নাই, তখন গর্ভধারিণী জননীকে পুত্র রামমোহন ইহার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ করেন। মুখের উপর বলিয়াছিলেন, "তুমি কেন বাবার সহিত মরিতে পার নাই?"

তারপর রামমোহন কলিকাতায় আসিয়াই সহমরণ-প্রথা নিবারণকল্পে উপদেশ, গ্রন্থপ্রচার ও গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেন। এ সময়ে সহমরণের বিরুদ্ধে ইংরেজি ও বাংলায় রামমোহন তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করিলেন এবং যথারীতি বিনামূল্যে দেশের সর্বত্র বিতরণ করিলেন। কোনো বিষয়েই আন্দোলন করিতে হইলে জনমত গঠন করিতে হয়, ইহা রামমোহন জানিতেন। তারপর চলিল প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ। শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া রামমোহন প্রমাণ করিলেন, সহমরণ একটি লোকাচার মাত্র। ইহার পিছনে শাস্ত্রের কোনো সমর্থন নাই। প্রতিপক্ষ দল হুঙ্কার ছাড়িলেন— 'আলবৎ, ইহা শাস্ত্রসম্মত'। এইভাবে বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্কে যখন আসর জমিয়া উঠিয়াছে, তখন আসিলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। ইনি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেও তখন বিষয়টি লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। মহাসভার বহু সদস্য ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামমোহন সে-সব খবর রাখিতেন। রামমোহন দেখিলেন শাস্ত্র দ্বারা কুলাইবে না, কারণ শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সুবিধামত শাস্ত্র মানিতেন, সুবিধামত ব্যাখ্যা করিতেন। যুক্তিও তাঁহারা মানিতে চাহিলেন না। রামমোহন তখন গভর্ণমেণ্টের দিকে তাকাইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই বেণ্টিঙ্ক আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন।

রামমোহনের ন্যায় উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কও একজন প্রকৃত সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাই কার্যভার গ্রহণ করিয়াই বেণ্টিঙ্ক সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করিলেন। সতীদাহ-নিবারণে রামমোহনের আন্দোলনের কথাও তিনি শুনিলেন। সর্বাগ্রে তাঁহারই সহিত তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাহিলেন। রামমোহন

প্রথমে বেণ্টিঙ্কের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে সম্মত ছিলেন না। পরে অবশ্য তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন এবং বেণ্টিঙ্কের অসামান্য শিষ্টাচারই ইহার জন্য দায়ী ছিল। লাটভবনে বেণ্টিঙ্ক যথোচিত সমাদরের সহিত রামমোহনকে গ্রহণ করিলেন। দুই সমাজসংস্কারকের এই সাক্ষাৎকার ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক নন, মিস্টার বেণ্টিঙ্কই সেদিন রাজা রাম-মোহনকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিষয়টির যথাযথ বিবরণ জানিতে চাহিলেন। রামমোহন এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন। সতীদাহ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা এবং আর যাহা বলা আবশ্যক, তিনি একে একে সবই বলিলেন। সঙ্গে করিয়া সহমরণ-বিষয়ক বই তিনখানি লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি বেণ্টিঙ্কের হস্তে প্রদান করিলেন। কথিত আছে, রামমোহন প্রবল যুক্তি ও শাস্ত্রের নিদর্শন দিয়া তাহার সহিত হৃদয়ের সহানুভূতি মিশাইয়া তাঁহার বক্তব্য এমন সুন্দর ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে, উহা বেণ্টিঙ্কের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। এ-বিষয়ে কোনো আইন করা সঙ্গত হইবে কি না, গভর্ণর-জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে সেদিন রামমোহন রায় ঠিক সরাসরি কোনো রকম আইন প্রণয়নের অনুকূলে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন নাই।

ইহার পরই বেণ্টিঙ্ক তাঁহার ডেসপ্যাচে লিখিতেছেন (১৮২৯, ৮ই নভেম্বর):

"Every day's delay adds a victim to the dreadful list, which might perhaps have been prevented by a more early submission of the present question. I must acknowledge that a similar opinion as to the probable excitation of a deep distrust of our future intentions, was mentioned to me by that enlightened Native Rammohan Ray, a warm advocate of the abolition of *suttee* and of all other superstitions and corruptions, engrafted on the Hindu religion, which he considers originally to have been a pure deism.

It was his opinion that the practice might be suppressed, quietly and unobservedly, by increasing the difficulties and by direct agency of the police. He apprehends that any public enactment would give rise to general apprehension..."

অর্থাৎ, "রামমোহন রায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আইন পাশ করিয়া সতীদাহ-প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহার অভিমত ছিল, পরোক্ষভাবে নীরবে, পুলিশের সহায়তায় এই ধর্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য আইন পাশ করিয়া সতীদাহ-প্রথা একেবারে নিষেধ করিয়া দিলে লোকের মনে সন্দেহ হইবে।"

কিসের সন্দেহ? প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ। রামমোহনের বিরুদ্ধে হিন্দু-সমাজের গুরুতর অভিযোগ হইল যে, তিনি বিদেশীকে আমাদের ধর্মে বা সমাজ-জীবনে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বেণ্টিঙ্কের জবানীতেই দেখিতেছি, এই অভিযোগ নিতান্তই অমূলক অথবা ইহা বিদ্বেষ-প্রসূত। কিন্তু সতীদাহ-নিবারণের প্রণালী সম্বন্ধে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিষয়টি কাউন্সিলে তুলিলেন এবং ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সতীদাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আইনের মুখবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা রামমোহনেরই প্রদর্শিত যুক্তি, প্রমাণ ও উপদেশের প্রতিধ্বনি।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। রামমোহন ভিন্ন বেণ্টিঙ্ক আরো একজন বিজ্ঞলোকের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ হোরেস উইলসন। উইলসন বলিয়াছিলেন: "সতীদাহ হিন্দুধর্মের ঠিক অঙ্গ নহে—এইরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে প্রকৃত বাধা অতিক্রম করা হয় না, এড়ান হয় মাত্র, এইরূপ এড়ান বিপজ্জনক।" বেণ্টিঙ্কের ডেসপ্যাচে উইলসনের মন্তব্যেরও উল্লেখ আছে।

আইন পাশ হইল।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২৯, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া রইল।

তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিল।

রামমোহন প্রকাশ্যে বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দিত করিলেন।

পনর দিন পরেই বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় বহু সহস্র হিন্দু এই আইনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদপত্র দাখিল করিল। প্রায় এক হাজার হিন্দু ইহাতে স্বাক্ষর দিয়াছিল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সমাজপতি রাধাকান্ত দেব ছিলেন একজন। যেদিন রামমোহন বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দিত করিলেন, তাহার পরদিনই (১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি) রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যে 'ধর্মসভা' স্থাপিত হইল। বিধর্মীর বিধান বানচাল করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়াই প্রতিপক্ষরা এই সভা গঠন করিয়াছিলেন। এই সভার মঞ্চ হইতে তোপ দাগা হইল—রামমোহন বিধর্মী, রামমোহন কালাপাহাড়। প্রজার ধর্মে শাসক হস্তক্ষেপ করিল, এ রাজত্ব টিকিবে না—ইত্যাদি বহুবিধ বচন ধর্মসভার বেদী হইতে মাণিকতলার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কথিত আছে, এই সময়ে একদিন তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনকে বলিয়াছিলেন—"ধর্মসভা তোপ দাগিয়াছে"। রাজা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্মসভা, না গুরুম্‌-সভা? তবে পাল্টা তোপ আমিও দাগিতে জানি"।

—বেণ্টিঙ্ককে আপনি অভিনন্দনপত্র দিয়াছেন, ইহাতেই রাধাকান্ত চটিয়া গিয়াছেন শুনিলাম, বলিলেন নন্দকিশোর বসু।

—কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দরকার। এত বড়ো একটা সৎ কাজ যিনি সাহস করিয়া করিলেন, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিব না?

—ওঁরা নাকি আইনের বিরুদ্ধে আপিল করিয়াছেন? জিজ্ঞাসা করিলেন হরিহর দত্ত।

—হ্যাঁ। প্রিভি কৌন্সিলে ইহার শুনানী হইবে।

—আমরা কি করিব? জিজ্ঞাসা করিলেন কালী মুন্সী।

—সংগ্রাম। আমি শীঘ্রই ইংলণ্ড যাইতেছি।

টাউন হলে বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল উহার তারিখ ১৬ই জানুয়ারি, ১৮৩০। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর,

হরিহর দত্ত প্রমুখ তিনশত সংস্কার-সমর্থক হিন্দু সেদিন সতীদাহ-নিবারণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন। ইহা বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই লিখিত ছিল। ইংরেজি অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন হরিহর দত্ত। বাংলাটি পড়িয়াছিলেন কালী মুন্সী। এই হরিহর দত্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে একজন। টাউন হলে তিনি শুধু অভিনন্দনই পাঠ করেন নাই, প্রকাশ্যে একটি বক্তৃতা দিয়া সতীদাহ-নিবারণ আইনে দেশের কল্যাণ হইবে, এইরূপ মতও প্রকাশ করেন। যথাসময়ে পিতা তারাচাঁদ দত্তের নিকট পুত্রের এই বক্তৃতার সংবাদ গিয়া পৌছিল। পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পুত্রের মুখের উপর প্রাচীনপন্থী পিতা খোলাখুলি বলিলেন, "যেহেতু তুমি সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে এদেশের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছ, সেইজন্য তুমি আমার বাটিতে আর স্থান পাইবে না।" গৃহ হইতে বিতাড়িত হরিহর মাণিকতলায় রামমোহনের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। কথিত আছে, রামমোহন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ও আমার একই দশা"। পরে তিনি হরিহর দত্তের একটি ভাল চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। অনুগামীদের বিপদে রাজা সর্বদা সাহায্য করিতেন, মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেন না। রামমোহন-চরিত্রের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্য।

বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 'বিবাদভঙ্গার্ণব' পর্যন্ত স্মৃতিনিবন্ধ পাঠ করিলে সতীদাহকে শাস্ত্রবিহিত হিন্দু-ধর্মের অঙ্গীভূত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী মেধাতিথির মনুস্মৃতি-ভাষ্যে দেখা যায় সহমরণ ধর্ম নহে, অধর্ম, এবং এযাবৎ যত ধর্মসূত্র পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে বিষ্ণুস্মৃতি ভিন্ন আর কোনো সূত্রে সহমরণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। রামমোহনের সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত ছিল না; তথাপি তিনি সহমরণকে প্রকৃত হিন্দুধর্মের বহির্ভূত উপধর্মের মধ্যে গণ্য করিয়া অসামান্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

এই সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত মিলিয়াছিল রামমোহনের বেদনানুভূতি। এই অনুভূতির তাড়নাতেই তিনি সতীদাহ-নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ জার্মান সমাজবিজ্ঞানবিৎ জুলিয়াস লিপার্ট তাঁহার *The Evolution of the Culture* নামক পুস্তকের 'নরবলি' অধ্যায়ে লিখিয়াছেন : "বর্বর অবস্থায় জীবনধারণের জন্য উপস্থিত যাহা প্রয়োজনীয়, মানুষের তাহা ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা করিবার অভ্যাস না থাকায় বর্বর মানুষ সম্যকরূপে মৃত্যুযন্ত্রণা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না এবং অন্যের যাতনায় সমবেদনা অনুভব করিতে পারে না। বেদনানুভূতি ভিন্ন মানুষ চিন্তা করিতে পারে না। এই বেদনানুভূতি মানুষের জন্মগত নহে, ইহা তাহার চিন্তার ফল।" সহমরণ যুগপৎ আত্মবলি ও নরবলি ; নিঃসন্দেহে ইহা একটি নিষ্ঠুর বর্বর প্রথা। রামমোহনের সময়ে বাঙালির চিন্তা করিবার অভ্যাস ছিল না এবং সেই কারণেই তাহারা সতীদাহের মৃত্যুযন্ত্রণা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, "এদেশে রামমোহন রায়ের যখন আবির্ভাব, তখন তো রীতিমত দুর্গতির দিন, মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিল মোহাবৃত, আর সৃষ্টিশক্তি ছিল আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোন প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী তখন আমাদের ছিল না।" দেশের মধ্যে ধর্মের নামে একটি বর্বর প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা কেহ চিন্তা করিয়াও তখন দেখে নাই। আর চিন্তা করিবেই বা কেমন করিয়া? বেদনানুভূতি তো কাহারো মধ্যে ছিল না। রামমোহন আসিলেন সেই অনুভূতিশীল হৃদয় লইয়া। বাংলাদেশের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসে এইরকম বিশাল হৃদয় লইয়া আসিয়াছিলেন মাত্র আর দুইজন—বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দ। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের বেদনানুভূতি আরো গভীর ও ব্যাপক ছিল। বেন্টিঙ্ক তাঁহার ডেসপ্যাচের শেষ লাইনে লিখিয়াছিলেন : "আমি বিশ্বাস করি, জ্ঞানালোকে আলোকিতচিত্ত অনেক হিন্দুও আমার মত চিন্তা করেন, অনুভব করেন।" এই 'অনেক হিন্দু' বলিতে অবশ্য রামমোহন ও তাঁহার অনুগামীদেরই লক্ষ্য করা হইয়াছিল।

'সতীদাহ নিবারক আইন' বাতিল করিবার জন্য ধর্মসভার পক্ষ হইতে বিলাতে আপীল করা হইল। ব্রীফ্ লইয়া গেলেন একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবী, নাম মিঃ বেথি। পথিমধ্যে জাহাজডুবি হইয়া বেথির মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার

পূর্বেই রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে সতীদাহ-প্রথা নিবারণের অনুকূলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বরাবরে বহু হিন্দুর স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সমক্ষেই প্রিভি কৌন্সিল সতীদাহের অনুকূল আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত ভারতীয় নারীর মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ কালের অতলে চিরদিনের মতো বিলীন হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, সতীদাহ-নিবারণের মধ্য দিয়াই বাংলা তথা ভারতের পুরুষপ্রধান সমাজে, যে সমাজে নারী ভোগবিলাসের সামগ্রী মাত্র ছিল, ছিল যে 'ছায়েবানুগতা পতিন্'—নারীর পৃথক অস্তিত্বের মর্যাদা প্রথম স্বীকৃত হইল। এই স্বীকৃতির পথ দিয়াই ভারতবাসীর জীবনে, বাঙালির জীবনে ধীরে ধীরে নারী-ব্যক্তিত্বের শ্রদ্ধান্বিত প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই বৈপ্লবিক সংস্কার-প্রয়াসের ইহাই ফলশ্রুতি।

সতীদাহ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলিবার আছে। বাংলার পুরনারীদের বিশেষ করিয়া বিধবাদের অর্থনৈতিক জীবনের দুর্দশার কথা রামমোহন বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন। "রামমোহন রায় যে কেবলমাত্র বিধবাদের জ্বলন্ত চিতা হইতেই বাঁচাইয়াছিলেন তাহাই নহে আইন পাশ হইলে রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট শ্বশুর পরিবারে তাহাদের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা কল্পনা করিয়া আইন পাশ হইবার বহু পূর্বেই তাহাদের কবল হইতে বাঁচাইবার জন্য তিনি একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।" সম্বাদ কৌমুদীর ষষ্ঠ সংখ্যায় আমরা ভারতবর্ষে জীবনবীমা সম্বন্ধে প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা পাইতেছি। উহাতে রামমোহন লিখিয়াছেন: "এই মহানগরীর ধনী হিন্দুদের প্রতি নিবেদন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় অবস্থার জন্য বহু বিধবা যে অসহনীয় দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেন, তাহার কথা সহৃদয়তার সহিত স্মরণ করিয়া এদেশে সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রতিষ্ঠিত 'সিবিল ও মিলিটারি উইডোজ ফাণ্ড'-এর অনুরূপ একটি সমিতি যেন তাঁহারা উক্ত বিধবাদের এবং ভবিষ্যৎ বিধবাদের কল্যাণকল্পে প্রতিষ্ঠিত করেন।"

সমাজসংস্কারক রামমোহন কত দূরদর্শী ছিলেন এবং কতখানি বাস্তবপন্থী

ছিলেন—ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। সমাজে যৌথভাবে অর্থনৈতিক কল্যাণ-প্রচেষ্টার পথও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

সতীদাহ-প্রথা উঠিয়া গেল।

রামমোহন কিন্তু এইখানেই নিরস্ত হইলেন না।

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ, কৌলীন্য—এইসব প্রথা ও ব্যবস্থার ফলে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার মেয়েদের জীবনে দুর্গতির সীমা ছিল না, রামমোহন তাহা জানিতেন। তাঁহার সহমরণ-বিষয়ক গ্রন্থের এক অংশে ইহার মর্মস্পর্শী চিত্র আছে। সেই প্রথম নারীদের দুঃখ-দুর্গতি ভাষায় রূপ পাইল। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রামমোহনের মত এত প্রবল ছিল যে, তিনি তাঁহার চরমপত্রে (উইল) এই বিধান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কোনো পুত্র বা উত্তরাধিকারী একই সময়ে দুই পত্নীর স্বামী হইলে তাঁহার সম্পত্তির কোনো অংশ পাইবে না। বহুবিবাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়নের জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টকে উপদেশও দিয়াছিলেন। হিন্দুনারীর দায়াধিকার, অর্থাৎ পিতার সম্পত্তিতে কন্যার, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়েও রামমোহন কম চিন্তা করেন নাই। রামমোহন দায়াধিকারের প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও তুলিয়াছিলেন—তাহারই সুফল আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম হিন্দু কোড বিলের মধ্যে। কন্যাপণ ও কন্যা-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় মত উদ্ধৃত করিয়া রাজা তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের কথাও তিনি যে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন আছে এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। এইভাবে সামন্ততান্ত্রিক জীবনদর্শনের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া রামমোহন সর্বপ্রকারে বাংলা তথা ভারতের সমগ্র নারীজাতির কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। এইভাবেই সেদিন, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে একাকী এই পুরুষসিংহ হিন্দুসমাজকে সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

সমাজসংস্কারক রামমোহনের অপূর্ব মনীষার কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন : "রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গসমাজ প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া তিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন।" বস্তুত রামমোহনের মহিমা জ্ঞান-সমন্বয়ে যতখানি, ঠিক ততখানি তাঁহার বিশাল চিত্ত হইতে উদ্ভূত মানব-প্রেমের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইতিহাসে সংস্কারক রামমোহনের মূল্য এইখানেই।

॥ এগার ॥

এইবার শিক্ষাব্রতী রামমোহনের কথা বলিব। "Ram Mohan Roy is one of the greatest figures in Indian education. His influence in Bengal is not dead." এই কথা লিখিয়াছেন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যার ফিলিপ হার্টগ।*

চেতনার মশাল জ্বালাইয়া রামমোহন অগ্রসর হইলেন।

তীক্ষ্ণধী রামমোহন দেখিলেন শিক্ষার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি ও দৈন্য। ঠিক করিলেন এই অভাব দূর করিতে হইবে। শিক্ষা ভিন্ন মানবজাতির মঙ্গল ও উন্নতি অসম্ভব। ধর্মের আলোকই যথেষ্ট নয়; অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে শিক্ষার আলোকও দরকার। জাতির এবং জনসমাজের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশ একটিমাত্র পথেই সম্ভব। উহা শিক্ষা। কি ভাবে ভারতবাসীকে শিক্ষিত ও উন্নত করা যায়, রামমোহন তাহারও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন শিক্ষা চাই যাহা জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হইবে—এই কথা রামমোহন চিন্তা করিলেন। টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব দিয়া চলিবে না। নূতন যুগ আসিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা চাই। যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে এতটা উন্নত হইয়াছে, য়ুরোপের সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতবাসীর পরিচয় করাইয়া দিবার কথা প্রথম চিন্তা করিলেন রামমোহন রায়। ইংরেজি শিক্ষা ভিন্ন ইহা জানিবার উপায় নাই। তাই রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি কেবলমাত্র পুরুষদের শিক্ষার কথাই চিন্তা করেন নাই, সেই সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষার কথাও ভাবিয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ-বিষয়ে বাদানুবাদের একস্থলে প্রতিপক্ষকে রামমোহন বলিয়াছিলেন, "আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা

---

* স্যার ফিলিপ হার্টগ স্যাডলার কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার। *Some Aspects of Indian Education : Past and Present* গ্রন্থে স্যার ফিলিপ একাধিক স্থলে ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের শিক্ষাপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?" রাজার এই তিরস্কার-বাণী ব্যর্থ হয় নাই।

নূতন যুগের বাঙালিকে রামমোহন সর্বতোভাবে যুগপ্রতিনিধি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিলেন। বলিলেন, "তোমরা মুক্তির যুগের মানুষ"। এই একটিমাত্র বাক্যই সেদিন বিস্ফোরণের কার্য করিয়াছিল। বাঙালিকে সকল দিক দিয়া যুগপ্রতিনিধি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য রামমোহন সর্বাগ্রে ইংরেজি শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইলেন। রামমোহন বুঝিয়াছিলেন মুক্তির সর্বাঙ্গীন আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন অন্য পথ নাই, এবং বর্তমানকে জানিবার জন্য ও সমসাময়িক আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে এক নূতন ভবিষ্যৎকে জন্ম দিবার পক্ষে ইংরেজি ভাষা অপরিহার্য। আমরা দেখিয়াছি পরিণত বয়সে তিনি যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, য়ুরোপ হইতে যাঁহারা নূতন আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহারা রামমোহনের ইংরেজি জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বেন্থাম পর্যন্ত বলিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হয় যে, তিনি যেন রামমোহনের ন্যায় ইংরেজি লিখিতে পারেন। রামমোহন না থাকিলে পাদ্রীরা বাংলা তথা ভারতে যেমন অবাধ প্রচারের সুবিধা পাইত, রামমোহন না থাকিলে নৃশংস সতীদাহ-প্রথা যেমন লুপ্ত হইত না, তেমনি তিনি না থাকিলে এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এত দ্রুত ঘটিত কি না সন্দেহ। কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন তাই শিক্ষাবিস্তারের কথাটি সর্বাগ্রে চিন্তা করিলেন।

শিক্ষাপ্রসারে রামমোহনের প্রযত্ন সত্যই বিস্ময়কর।

রামমোহন সম্বন্ধে অধুনা যেসব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারই আলোকে আমরা জানিতে পারি যে, 'রামমোহন কেবল একটি স্কুল স্থাপন, হেয়ার সাহেব ও ডাফ সাহেবকে নানা প্রকার সাহায্য করিয়া ও ইউস্টেস কেরীকে স্কুল স্থাপনের জন্য জমি দিয়া বা ভারত সরকারকে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে দুই-চারটি মেমোরাণ্ডা দাখিল করিয়াই আপন কর্তব্য শেষ করেন নাই। তাঁহার চিন্তা এ-বিষয়ে এত জাগ্রত ছিল যে, ইহাই তাঁহার ধ্যান-ধারণা হইয়া উঠিয়াছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রামমোহনের নিকট

শিক্ষা বিলাসের বস্তু ছিল না। রামমোহন জানিতেন যে অধঃপতিত জাতিকে পুনরায় আপন মর্যাদায় স্থাপন করিতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেই হইবে। ইংরেজদের সহিত জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদের ন্যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্তে আনিতে হইবে। শিক্ষাবিস্তারে রামমোহনের যে অনুরাগ তাহার মূলে ছিল জাতির জীবনরক্ষা—এই তাগিদ।'

প্রসঙ্গত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষানীতির কথা একটু বলিতে হয়। এদেশে সেই সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একদল চাহিতেছিলেন, দেশে সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষার প্রচলন হউক। অপর দল ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, অথচ তিনিই সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা করিয়া লিখিলেন—এই শিক্ষা ভারতকে অজ্ঞানতায় ডুবাইয়া রাখিবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান অভিযোগ—এই দর্শন নেতিবাদী। তিনি এই ধরণের নেতিবাদী শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচলনের সুপারিশ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আরো মনে করিতেন যে, ইংরেজিকে এই নূতন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষার গণ্ডির মধ্যে থাকিলে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইংলণ্ডের মত সু-উন্নত হইতে পারিবে না—এই কথা সেদিন রামমোহনের ন্যায় আর কোনো ভারতবাসী চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। রামমোহনের চিন্তায় আরো একটি সত্য ধরা পড়িয়াছিল। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ইংরেজশাসন অজ্ঞাতসারে একদিন ভারতে সমাজবিপ্লব আনিয়া দিবেই এবং সেই বিপ্লব বহু সম্ভাবনাপূর্ণ। ইংরেজি শিক্ষা ভিন্ন সেই বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব ছিল না।

পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় আটান্ন বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এই দীর্ঘকাল রাজ্যব্যবসায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষের এখানে-ওখানে নানারকম যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া কাটাইতে হইয়াছে। শাসনসংস্কার ও ভূমিরাজস্ব-সংস্কার ভিন্ন বিদেশী শাসক অন্য কোনো বিষয়ে সংস্কারের কথা চিন্তা করিয়া দেখেন

নাই। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তখনো পর্যন্ত গুরুতর কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নাই। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা শাসকদের নিজেদের স্বার্থেই; শাসনযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই কলেজ স্থাপনের অন্যতম এবং প্রধানতম লক্ষ্য। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই 'paved the way for English education by bringing officers and Indian scholars together so that they could learn each other's language.' এসিয়াটিক সোসাইটির মতনই ইহা সেদিন প্রাচ্য-পশ্চাত্য মিলনের ক্ষেত্র অনেকখানি তৈরী করিয়া দিয়াছিল। তখনো পর্যন্ত ইংরেজের শিক্ষানীতি বলিয়া কিছু ছিল না। জনসাধারণের শিক্ষার কথা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, ব্যয়-বরাদ্দ করা তো দূরের কথা। বেসরকারী ভাবে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ কিছু কিছু ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেরও মুখ্য অভিপ্রায় ছিল খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করা। মোট কথা, ব্র্যাণ্ডি, বেয়নেট আর বাইবেল হাতে করিয়াই শাসক ইংরেজ প্রথম যুগে এই দেশে আসিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন শিক্ষার বিষয়টি তাই গভীরভাবে চিন্তা করিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রামমোহন কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পূর্বে বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার অবস্থা কি রকম ছিল তাহা আমরা রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন: "এতদ্দেশীয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়। পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ সেই সাহায্য রহিত হয়। তাহার পরে শরবোরণ সাহেব কলিকাতায় এক স্কুল খুলেন। শরবোরণ সাহেব ফিরিঙ্গি ছিলেন। তিনি এক প্রকার বাঙালি ছিলেন বলিলেই হয়। শুনিয়াছি, তিনি প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি

মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন। পরে আরাটুন পিত্রুস নামে আর একজন সাহেব আর একটি স্কুল স্থাপন করেন।...প্রথমে ইংরেজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া তখনই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।"

ডেভিড হেয়ার।

দুর্গতি-দুর্গম বাংলা দেশে এই মহাপ্রাণ ইংরেজের আগমন নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল সেদিন। ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে হেয়ার সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। রামমোহন যখন দ্বিতীয়বার গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সপরিবারে কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ডেভিড হেয়ার ও উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় আসেন (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে)। হেয়ার সাহেব রামমোহন অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট ছিলেন। এই একই বৎসরে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। নাস্তিক বলিয়া হেয়ারের দুর্নাম ছিল, গোঁড়া পাদ্রীসমাজে তাই তাঁহার বিশেষ স্থান ছিল না। কলিকাতার মিশনারি সমাজ এই মানুষটির প্রতি এমনই বিরূপ ছিল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কোনো খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিবার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। এমন লোকের সহিত যে কর্মক্ষেত্রে রামমোহন উত্তরকালে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, বরং ইহাই ছিল প্রত্যাশিত।

রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন: "ডেভিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কটলণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দিগের ইংরেজি শিক্ষার সৃষ্টিকর্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

নব্যবঙ্গের প্রথম দীক্ষাগুরু হেয়ার সাহেবই কলিকাতা শহরে হিন্দুসাধারণের শিক্ষার জন্য প্রধানত নিজব্যয়ে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমে

হেয়ার স্কুলের নাম ছিল 'স্কুল সোসাইটির স্কুল'। হেয়ার সাহেব ছিলেন এই স্কুলের প্রাণস্বরূপ। এই সোসাইটি কালীতলায় একটি বিদ্যালয় ও দুইটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ইংরেজি স্কুল-দুইটির মধ্যে একটি ছিল হেয়ার সাহেবের স্কুল। কলিকাতায় আসিবার অব্যবহিত পরেই রামমোহন ডেভিড হেয়ারের সহিত পরিচিত হইলেন। পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। রামমোহনের মাণিকতলার বাড়িতে হেয়ার সাহেব প্রায়ই আসিতেন এবং তাঁহার সহিত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। ইহা 'আত্মীয় সভা' স্থাপনের এক বৎসর পরের ঘটনা। হেয়ার-রামমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সমসাময়িক বাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। উভয়ের মধ্যে সেদিন যে সহৃদয়তা, যে আত্মীয়তা দেখা গিয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ কাহিনী আজো কেহ লেখে নাই। কথিত আছে, মাণিকতলার বাড়িতে রামমোহন মধ্যে মধ্যে হেয়ার সাহেবকে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। দেশীয় খাদ্যদ্রব্যই বিশেষভাবে তাঁহাকে পরিবেশন করা হইত। ইহার মধ্যে একটি পদ ছিল মাগুর মাছের ঝোল। হেয়ার সাহেব এই মাগুর মাছের স্বাদ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

রাজনারায়ণ বসুর 'ইতিবৃত্ত' হইতে আবার কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি: "হেয়ার সাহেব প্রথমে রাজা রামমোহনের নিকট ভাল প্রণালীতে একটা বৃহৎ ইংরেজি স্কুলের স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হয় নাই। পরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যিনি হাইকোর্টের পরলোকগত জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, তিনি উহা প্রস্তাব করাতে কার্যে পরিণত হয়। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যূষে ভ্রমণ করিবার সময় স্যার জন হাইড ঈস্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। স্যার জন হাইড ঈস্ট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হাইড ঈস্ট ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৬ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদিগের এক সভা অহ্বান করেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।"[৫]

রামমোহন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা ঈস্ট সাহেবের ভবনেই হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন: "About the beginning of May, a Brahmin of Calcutta whom I know, and who is well-known for his intelligence among the principal native inhabitants and also intimate with many of our own gentlemen of distinction called upon me and informed me that many of the leading Hindoos were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner as practised by Europeans...The meeting was held at my house on the 14th of May, 1816 at which 50 and upwards of the most respectable Hindoo inhabitants of rank and wealth attended...all expressed themselves in favour of making the acquisition of the English language a principal object of education."

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শাসকবর্গ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যতটা না করিয়াছেন, জনমতের চাপে পড়িয়াই বেশি করিয়াছেন—বিশেষ করিয়া ডেভিড হেয়ার ও রামমোহনের নির্বন্ধাতিশয্যেই ইহা সেদিন সম্ভবপর হইয়াছিল। আলেকজান্দার ডাফ স্বয়ং পার্লামেণ্টারি কমিটির সম্মুখে এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজ স্থাপনের জন্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রথম দফায় প্রাপ্ত চাঁদার পরিমাণ ছিল ১,১৩,১৫৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈস্ট সাহেবকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায়ের নিকট হইতে যেন কোনো চাঁদা না লওয়া হয়, কারণ তিনি আমাদের হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। স্থাপিত হইয়া অবধি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার নাম ছিল 'হিন্দু বিদ্যালয়' এবং তারপর হইতে জেনারেল কমিটির কাগজপত্রে ইহাকে 'হিন্দু কলেজ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, দেখা যায়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র লইয়া স্কুল খোলা হইল। এই স্কুলই পরে উন্নত হইয়া হিন্দুকলেজে পরিণত হয়। গরাণহাটা

হইতে জোড়াসাঁকোয় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি, আবার সেখান হইতে টেরিটি বাজার, এইভাবে স্কুল ক্রমান্বয়ে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়িত্ব লাভ করে। ইহার পিছনে রামমোহনের হাত ছিল। তিনি ভিন্ন হিন্দুকলেজ কোনো দিনই উন্নত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তবে কলেজের পরিচালনা-ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখেন নাই।

ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে রামমোহন এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে প্রথমে তিনি এ-বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বা কলিকাতার জনসাধারণের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। হিন্দুকলেজের উদ্যোগ-পর্বেই আমরা দেখিতে পাই যে তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি 'য়্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। রামমোহনের এই ইংরেজি বিদ্যালয়টি প্রথমে হেদুয়ার সন্নিকটে সুঁড়িপাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল; পরে ঐ অঞ্চলেই হেদুয়ার উত্তরে একখণ্ড জমি কিনিয়া স্কুলের নিজস্ব বাটি রামমোহন নিজব্যয়ে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে করিয়া দিয়াছিলেন। মিঃ মোরক্রফট নামে একজন ইংরেজ ছিলেন এই স্কুলের অধ্যক্ষ। তাঁহার বেতন ছিল একশত টাকা; অপর একজন শিক্ষকের বেতন ছিল আশী টাকা। ছাত্ররা এইখানে ইংরেজি শিক্ষা পাইত। রামমোহন নিজেই এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। এ্যাডাম স্কুলের কার্য পরিদর্শন করিতেন। রাজার নব-প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে প্রায় আশীজন হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে এই স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। কথিত আছে, রামমোহন বালক দেবেন্দ্রনাথকে নিজের গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন। রামমোহনের এই নিজস্ব শিক্ষায়তনটি সম্পর্কে আরো একটি কথা বলিবার আছে। এখানে ছাত্রদের জন্য যে সব পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক ভল্‌তেয়ার প্রণীত 'সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের ইতিহাস' বইখানি (ইংরেজি অনুবাদ) স্থান পাইয়াছিল। ছাত্রদিগকে ইহা হইতে বাংলা তর্জমা করিতে হইত।

কিন্তু রামমোহনের শিক্ষা-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় পর বৎসর হইতে। এই আন্দোলনে তাঁহার প্রতিভা, পাণ্ডিত্য দূরদৃষ্টি ও মহানুভবতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই প্রথম ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতির জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ শিক্ষা এদেশের উপযোগী হইবে, তাহা তখনো পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই। বিষয়টি লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। চারিদিকে তুমুল বিতর্ক—ইংরেজি, না সংস্কৃত, ফার্সি ও আরবি? একদল লোক শুধু প্রাচ্য প্রণালীতে শিক্ষাদান সমর্থন করিলেন। অপর দল য়ুরোপীয় প্রণালীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইলেন। এই শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

লর্ড আমহার্স্ট তখন গভর্ণর-জেনারেল। দুইপক্ষে তুমুল বাদ-প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। এমন কি হোরেস হেম্যান উইলসন পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। এই সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ ইংরেজই সতীদাহ-নিবারণ-আন্দোলনের সময়ে, রাধাকান্ত দেবের প্ররোচনায়, রাম-মোহনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। রামমোহন ইহা বিস্মৃত হন নাই। সরকারী মহলে উইলসনের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও তিনি জানিতেন। গভর্ণমেণ্ট প্রাচীনপন্থীদেরই মত অনুসরণ করিতে চাহিলেন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হইবে—রামমোহন এই সংবাদ পাইলেন। এত টাকা কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় হইবে? দেশের লোক ইংরেজি শিখিতে পাইবে না? হিন্দু স্কুলের উন্নতির ভরসাই বা কোথায়? এইসব চিন্তা করিয়া রামমোহন কলম ধরিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, অন্ধকারের মধ্যে ভারতবর্ষকে তিনি আর পড়িয়া থাকিতে দিবেন না। রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন। ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের ইতিহাসে রামমোহনের এই ঐতিহাসিক পত্রের গুরুত্ব অসাধারণ। রামমোহনের দূরদৃষ্টির সুফল ফলিতে বারো বৎসরের বেশি সময় লাগে নাই। তাঁহার এই পত্র দ্বারাই সেদিন কোম্পানীর শিক্ষানীতি নির্ধারিত হইয়া ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সূচনা করিয়া দিয়াছিল। এই একটিমাত্র কার্য দ্বারাই রাজা রামমোহন রায় অমর হইয়া আছেন।

সেই চিঠিতে রামমোহন গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে—"সংস্কৃত শিক্ষা তো এদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। চতুষ্পাঠী, টোল প্রভৃতি যাহা রহিয়াছে, সেগুলিকে সাহায্য করিলেই সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাতে আমাদের দেশের প্রকৃত উপকার হইতেছে না। ইহা দ্বারা যুবকদের মাথায় ব্যাকরণ, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের কতগুলি খুঁটিনাটি ও তর্কযুক্তি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়; কর্মজীবনে তাহা কোনো কাজেই লাগে না। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের ফল হইবে দেশকে অন্ধকারেই রাখা।···অধিক উদার ও উন্নতভাবে পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-শাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করিতে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতেই এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। য়ুরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন শিক্ষিত প্রতিভাশালী লোককে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের যে কল্যাণ কামনা করেন, তাহা শুধু এই প্রণালীর শিক্ষা দ্বারাই সম্ভব হইবে।" *

রাজার এই পত্রখানি ইংরেজিতে লিখিত। ভাষা, জ্ঞান ও যুক্তির সম্পদে এই চিঠিখানির তুলনা নাই। ধর্ম সম্বন্ধে যেমন ট্রাস্ট-ডীড, শিক্ষা সম্বন্ধেও তেমনি এই পত্রখানিকে একটি মূল্যবান 'দলিল' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সে সময়ের সুবিজ্ঞ ইংরেজগণ পর্যন্ত ইহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। বিশপ হিবর লিখিয়াছিলেন: "এই পত্রের ভাষা ও ভাব এত সুন্দর এবং ইহার যুক্তিগুলি এত হৃদয়গ্রাহী যে একজন এশিয়াবাসীর পক্ষে এরূপ পত্র লেখা একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।" এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গভর্ণর-জেনারেলকে দিবার জন্য রামমোহন বিশপ হিবরের হাতেই এই চিঠিখানি দিয়াছিলেন। তিনি সরাসরি পাঠাইলে হয়ত লাট-দরবারে উহা উপেক্ষিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা বা অনুমান করিয়াই রামমোহন এইরূপ একজন উচ্চপদস্থ লোকের মারফৎ পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

*মূল পত্রখানি গ্রন্থের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহলে রাজার প্রভাব-প্রতিপত্তির ইহাও একটি নিদর্শন।

রামমোহন স্বয়ং প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও এবং সংস্কৃত শিখাইবার জন্য একটি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও, ইংরেজি ভাষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি শিখাইবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহার্স্টকে যখন এই আবেদনপত্রখানি পাঠাইয়াছিলেন তাহা তখনই ফলদায়ক হয় নাই। কিন্তু পরে যে ইংরেজি শিখাইবার পক্ষপাতী 'ইংলিশ পার্টি' নামক দলের উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাব এবং লর্ড মেকলের মন্তব্য—ইহারই ফলে বেন্টিঙ্ক ইংরেজি শিক্ষা চালাইবার দিকে মত দেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে এই ইংলিশ পার্টির উদ্ভব সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের আবেদনপত্রের ফলেই এই পার্টির উৎপত্তি। এই পার্টি চাপ না দিলে মেকলের মিনিট অন্য রূপ হইত সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেদিন রামমোহন যদি যুক্তিপূর্ণ এই পত্রখানি না লিখিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা আরো কিছুকালের জন্য পিছাইয়া যাইত।

রামমোহনের এই আন্দোলনের ফলেই সংস্কৃত কলেজের প্রস্তাবিত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর, হিন্দু কলেজের নামেই ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড আমহার্স্ট স্বয়ং ইহা স্থাপন করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই ভবনে স্থাপিত হইল। ইংরেজি শিক্ষার পক্ষ যাহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই জয় হইল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য যে কমিটি হইয়াছিল, রামমোহন তাহার একজন সভ্য ছিলেন। রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদী, হিন্দু সভ্যগণ এই কারণ দেখাইয়া কমিটি হইতে সরিয়া যাইতে চাহিলেন। আদর্শবাদী রামমোহনের নিকটে আদর্শই ছিল বড়ো, ব্যক্তিগত মর্যাদা গৌণ। তিনি তৎক্ষণাৎ সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত রামমোহন সেদিন বলিয়াছিলেন: 'আমি কমিটিতে থাকিলে যদি কলেজের লেশমাত্রও অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমি সে সম্মানের প্রয়াসী নহি।' ডেভিড হেয়ারের জীবনীকার প্যারীচাঁদ মিত্র হেয়ারের জীবনচরিতে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "রামমোহন রায়ের উদার

চরিত্র ছিল ; তিনি দেশের হিত সর্বদা প্রার্থনা করিতেন এবং আপন যশঃগৌরব অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতেন।"

ইহার দুই বৎসর পরের ঘটনা।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

রামমোহন 'বেদান্ত কলেজ' স্থাপন করিলেন। ইংরেজি শিক্ষার পুরোধার পক্ষে এই নামে একটি স্কুল স্থাপন করিতে দেখিয়া সেদিন অনেকেই বিস্মিত হইলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কেন রামমোহন সেদিন সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষ করিয়া বৈদান্তিক মত ও হিন্দু দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজির স্বপক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন? রামমোহন বেদান্তদর্শনের বিরোধী ছিলেন না। থাকিলে, বাংলায় উহার ভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার সমগ্র ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ভিত্তিমূলই তো ছিল বেদান্তদর্শন। এমন কি, ইহাই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের ভিত্তি। রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলিতে ইহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। তবে তিনি ইংরেজির পক্ষে ও সংস্কৃতের বিপক্ষে লেখনী পরিচালনা করিলেন কেন? ইহার একমাত্র উত্তর রামমোহনের প্রখর ইতিহাসবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। রামমোহন বেদান্ত মানিতেন, কিন্তু ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। অদ্বৈতবাদী রামমোহন সকল পদার্থের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতেন এবং 'অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও তিনি লৌকিক কর্তব্যাকর্তব্য, ধর্মাধর্ম ও নৈতিক দায়িত্বে বিশ্বাস করিতেন।' এইখানেই রামমোহন আধুনিক এবং আধুনিক বলিয়াই তিনি দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন চাহিয়াছিলেন।

মাণিকতলা স্ট্রীটের ৭৪ নম্বর বাড়িতে রামমোহনের বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিদ্যালয়ে হিন্দু একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্রগণকে শুধু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐখানে বাংলা অথবা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ শিক্ষা দেওয়ারও অভিপ্রায় রামমোহনের মনে ছিল। কার্যত সেটি হয় নাই।

১৮৩০।

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষের সন্ধিক্ষণ।

রামমোহনের আহ্বানে স্কচ মিশনারি আলেকজান্দার ডাফ্ আসিলেন কলিকাতায়। এদেশে ইংরেজি শিক্ষাপ্রসারে এই ডাফ্ সাহেবের নামও স্মরণীয়। অবশ্য স্কটল্যাণ্ড মিশনের 'জেনারেল এসেমব্লি'র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডাফ্ সাহেবের মারফৎ এই দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা। ডাফ্ যে সে কাজ করেন নাই তাহা নহে, তবে তিনি ইংরেজি প্রসারের জন্যও যথেষ্ট করিয়াছেন। তখনকার দিনে হিন্দু পাড়ায় মিশনারি স্কুল স্থাপন বড়ো সহজ কথা ছিল না। স্কুল স্থাপনের পথে বহু বিঘ্ন দেখা দিল। ডাফ্ রামমোহনের শরণাপন্ন হইলেন। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "যখন শহরের ভদ্রলোকেরা এমনি বিরোধী হইলেন যে, স্কুলের জন্য দেশীয় বিভাগে একটি বাড়ি ভাড়া করা ও পড়িবার জন্য বালক সংগ্রহ করা ডাফের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, তখন রামমোহন রায়কে এই বিঘ্ন-বাধার কথা জানাইলে তিনি ডাফের স্কুল বসাইবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের পূর্বাশ্রিত ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি ডাফের স্কুলের জন্য স্থির করিয়া দিলেন এবং আপনাদের বন্ধুবান্ধবের পরিবার হইতে প্রথম ছয়টি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন। ইহা করিয়াও নিরস্ত হইলেন না; স্কুল খুলিবার দিন (১৩ই জুলাই, ১৮৩০) নিজে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে উৎসাহিত করিলেন এবং তৎপরে সর্বদা গিয়া স্কুলের কার্য পরিদর্শন-দ্বারা ও পরামর্শদানাদি-দ্বারা ডাফকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।"

ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে ইহাই রামমোহনের শেষ জনহিতকর কাজ। এই ঘটনাটি দ্বারা রামমোহনের চরিত্রের যে জিনিসটি আমাদের চক্ষে পড়ে তাহা হইল তাঁহার অটল সংকল্প-শক্তি। সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে রামমোহন কখনো তাঁহার সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন নাই, বিঘ্ন দেখিয়া হটিয়া যান নাই। ষোল বৎসর বয়সের সময়ে তিনি যখন গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তখনো যে-সংকল্প, জীবনের পরিণত বয়সে প্রত্যেকটি কর্মে সেই একই সংকল্প দ্বারা রামমোহন চালিত হইতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মিথ্যা বলেন নাই—'রামমোহন রায়ের বজ্রমুষ্টি বুলডগের কামড়ের ন্যায় ছিল।'

ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে রামমোহন যখন তাঁহার ঐতিহাসিক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময়ে বাহিরের যে ঘর-দুইখানিতে সমাজের অধিবেশন বসিত, সেই ঘরে দুইখানি টানা পাখা রাখা হইয়াছিল। সমাজ অন্যত্র উঠিয়া যাইবার পর পাখা দুইখানি রহিয়াই গিয়াছিল। ডাফ্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া রামমোহন যখন সেই ঘরে আসেন, কথিত আছে, ঘরের টানা পাখার প্রতি আঙুল দেখাইয়া রামমোহন হাসিয়া ডাফ্ সাহেবকে বলিয়া ছিলেন—"I leave you that as my legacy." ডাফের স্কুলের নাম রাখা হয় 'জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশন'।

ডাফ্ সাহেবের স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করা হয়। ইহাতে ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। অভিভাবকগণও শঙ্কিত হইলেন। তবে কি ডাফ্ সাহেব তাঁহাদের ছেলেগুলিকে খ্রীষ্টান করিবার মতলবে আছেন? অভিভাবকদের অনেকেই রামমোহনের বন্ধু এবং রামমোহনেরই অনুরোধে তাঁহারা ডাফ্ সাহেবের স্কুলে ছেলে পাঠাইয়াছেন। রামমোহন একদিন স্কুলে আসিলেন। ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—"বাইবেল পড়িলেই লোক খ্রীষ্টান হয় না। ডাক্তার উইলসন হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়াও হিন্দু হন নাই। আমি বহুবার কোরান পড়িয়া মুসলমান হই নাই। আমি সমস্ত বাইবেল যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছি। তোমরা জান আমি খ্রীষ্টান নই, এই যে আমার গলায় পৈতা পর্যন্ত রহিয়াছে। তোমরা বাইবেল পড়িতে ভয় পাও কেন? বাইবেল পড়িয়া নিজেরা ইহার সম্বন্ধে বিচার কর, তবে তো অন্য ধর্মের সহিত তোমার ধর্মের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে।"

জাতির সর্বাত্মক জাগরণের পক্ষে সেদিন এমনি উদার চিন্তার, এমনি অপূর্ব জ্ঞান-সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল।

রামমোহনের দৃষ্টান্তে, কালীনাথ মুন্সী তাঁহার স্বগ্রাম টাকিতে একটি স্কুল স্থাপন করিবার জন্য ডাফ্ সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। রামমোহনের শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশকে সর্বদাই কার্যে প্রতিপালন করিতে সচেষ্ট ছিলেন।

লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের চিঠি সেই সময়ে উপেক্ষিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক ইংলিশ পার্টির প্রভাবে সেই পত্রের সমস্ত ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য

প্রণালীতে ইংরেজি শিক্ষা-প্রবর্তনের সূচনা করিয়া যান। মেকলের প্রসিদ্ধ 'মিনিট' রামমোহনের চিঠির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছিল। মেকলের বারো বৎসর পূর্বে রামমোহন ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষাপ্রচলনের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। স্যার সি. ই. ট্রেভেলিয়ানও তাঁহার *The Education of India* নামক গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে মেকলের 'মিনিট' নয়, লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিবাদ পত্রখানিই এই দেশে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রামমোহনের সময়ে বাংলা দেশে হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে 'যাঁহারা শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন, শিক্ষাদানই কেবল তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল কিন্তু রামমোহন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চাহিয়াছিলেন তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টির ফলে। তিনি জানিতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বলীয়ান জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামে আঁটিয়া থাকিতে হইলে আমাদেরও সেই বিদ্যা আয়ত্তে আনিতে হইবে—'নান্য-পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। সেইজন্য শিক্ষাপ্রবর্তনে রামমোহনের দান অতুলনীয়।'

যাঁহারা যুগনায়ক তাঁহারাই তাঁহাদের সমকালীন সময়ের পরিধি অতিক্রম করিয়া অনাগত কালের কথা নির্ভুলভাবে চিন্তা করিতে পারেন এবং চিন্তা করিয়া প্রকৃত পথ নির্দেশ করিতে পারেন।

॥ বারো ॥

এইবার রামমোহনের রাষ্ট্রীয় চেতনার কথা বলিব।

রামমোহন যেমন রাজনীতিজ্ঞ, তেমনই আইনজ্ঞ ছিলেন। অর্থনীতিও তিনি কম বুঝিতেন না। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যিনি নবযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, এই দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথও তিনিই প্রথম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাঙালির হাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার তুলিয়া দিবার জন্য তিনি যেমন অনেকগুলি অভ্রান্ত নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন তেমনি রাষ্ট্রনীতিতে বাঙালিকে দীক্ষা রামমোহনই দিয়া গিয়াছেন। তিনি পথ না দেখাইলে আমরা দেশের কথা এমন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিতাম কি না সন্দেহ। এই জন্যই তো আমরা তাঁহাকে জাতির বীজপ্রদ পিতার গৌরব দিয়া থাকি। রামমোহন তাঁহার আত্মচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন: "ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বাহিরে কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।" তখন রামমোহনের বয়স ষোল বৎসর। মুসলমান রাজত্বের অধীনতা হইতে ইংরেজ রাজত্বের অধীনে আসা—এই পরিবর্তন বিধি-নির্দিষ্ট সুনিয়ম বলিয়াই ভারতবাসী মানিয়া লইয়াছিল। দেশটা বিদেশীর শাসনে আসিয়াছে, এই কথাটি সেদিন অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে—ষোল বৎসরের একজন বালকের সতেজ মস্তিষ্কে একটু আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। এইখানেই রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তার উৎস। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই রামমোহনের এই বিদেশী শাসনের প্রতিকূল মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের কারণ তাঁহার ইতিহাস-সচেতনতা। রামমোহন পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস পড়িলেন এবং তাহারই আলোকে দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিলেন। অবশেষে সেই অবস্থার উন্নতিসাধনে স্বীয় প্রতিভা ও শ্রম নিয়োগ করিলেন।

রামমোহনের কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। তিনি দেখিলেন দেশের লোককে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সংবাদপত্র প্রয়োজন। যাহা প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। তিনি বাংলা ও ফার্সি ভাষায় দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। বাংলা কাগজ 'সংবাদ কৌমুদী'

প্রথমে প্রকাশিত হইল। ইহার অনুষ্ঠান পত্রেই লিখিত ছিল, 'ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পারিবারিক ঘটনা, বিদেশীয় ও দেশীয় সংবাদ' এইসব বিষয়েই আলোচনা হইবে। ইহার প্রত্যেক সংখ্যায় রাষ্ট্রীয় মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইত। সাধারণ লোকদের জন্যই 'সংবাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হইয়াছিল। একটু শিক্ষিতদের জন্য 'মিরাৎ-উল্-আখবার্' প্রকাশ করেন। ইহাতে বিশেষভাবে য়ুরোপ ও ইংরেজ জাতির রাজনীতি আলোচনা হইত। দেশীয়দের সহিত ব্যবহারে ব্রিটিশ জাতির ঔদ্ধত্যের কথাও থাকিত।

রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক কর্মপ্রয়াসের কথা বলিতে হইলে, একটু ইতিহাসের কথা বলিতে হয়। মধ্যযুগের বাংলার গ্রামীণ সমাজ। সে সমাজে ছিল সমষ্টিগত আদর্শবোধ, ছিল সমবেত কর্মপ্রয়াস। তথাপি মধ্যযুগের বাঙালিকে আধুনিক অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি বলিয়া চিহ্নিত করা চলে না। সেদিন যাহা ছিল তাহা একটি সুগঠিত বাঙালি সমাজ। ইহার অধিক কিছু নহে। জাতিবোধের ভিত্তিই হইল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতা। ইহাই জাতিধর্মের একটি বহিরঙ্গ লক্ষণ। জাতিত্ব পদার্থটি নিরালম্ব বায়ুভুক্ কিছু নহে, ইহার একটি বাস্তব সত্তা আছে। অধিকার এবং দায়িত্ববোধের অন্তরঙ্গ সচেতনতা ও সুস্পষ্টতাই হইল জাতিত্বের আশ্রয়। মধ্যযুগের বাংলা দেশে গোষ্ঠীবন্ধন ছিল, ছিল তাহার উপযোগী আদর্শ ও অর্থনৈতিক কাঠামো। কিন্তু সমষ্টিগত জীবনের বৃহৎ প্রচ্ছদরূপে সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে তৎকালীন সামাজিকের কোনো অবহিত অধিকার অথবা সক্রিয়তার চিহ্ন ছিল না। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জীবনধর্মের পক্ষে জাতিত্বের চেতনা ছিল সহজাত। বাংলার পক্ষে ভারতবর্ষের পক্ষেও তাহা সমভাবে সত্য। রামমোহনের সমকালীন ভারতবর্ষ জাতিত্ববোধ-বর্জিত ভারতবর্ষ।

আমাদের দেশে স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বাজাত্যাভিমান প্রথম স্ফুটবাক্ হইয়াছে রামমোহনের মধ্যে। রামমোহন আধুনিক বাংলা, তথা আধুনিক ভারতের স্বাধিকার-সচেতন দায়িত্বশীল প্রথম নাগরিক। রামমোহন একটি আধুনিক নাগরিক মাত্র নহেন—স্বাধীনতা, স্বাভিমান, মানবপ্রেমের অপার

প্রসার লইয়া তিনি বাংলার প্রথম আত্মসচেতন ব্যক্তি। রামমোহনের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও মনীষার মধ্যে বাঙালির অনাগত যুগজীবনটি যেন তাঁহাকে পূর্ব হইতেই সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করিয়া দেখিয়াছিল। রামমোহন ইংরেজি শিক্ষা চাহিয়াছিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইংরেজি শিক্ষা ভিন্ন বাঙালির অন্তরে সুচিন্তিত জাতিবোধের উন্মেষ হইবে না। ধর্ম ও সমাজে রামমোহন যে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, শিক্ষামূলক সংস্কার-প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া তিনি সেই বিপ্লবেরই উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া বিপ্লবের গতিকে তিনি আরো দুর্বার করিয়া তুলিলেন।

রাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার সংবাদপত্র, রামমোহন ইহা জানিতেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ 'সমাচার দর্পণ'-এর মাধ্যমে অবাধ হিন্দুধর্ম-বিরোধী প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেছিল। রামমোহন ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিলেন। একাধিক ধর্মপ্রাণ স্বদেশীর উৎসাহে ১৮২১-এর ৪ঠা ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। পত্রিকাটি প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহী লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামমোহন। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু প্রথম তিনটি সংখ্যার পরেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংস্রব ত্যাগ করেন। রামমোহনের সতীদাহ-নিবারণ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে ভবানীচরণের রক্ষণশীলতা আহত হয়; মতপার্থক্যই এই সংস্রবত্যাগের কারণ, রামমোহনের জীবনচরিতকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। পরে এই ভবানীচরণই, রাধাকান্ত দেবের প্রভাবে এবং প্ররোচনায় রামমোহনের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং 'ধর্মসভা'র সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভবানীচরণের প্রতিভার সহিত রামমোহনের প্রতিভা যদি মিলিত হইত, তাহা হইলে সেদিন সমাজ-সংস্কারে রামমোহন আরো বেশি অগ্রসর হইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শিবিরে যোগদান করিয়া প্রতিপদে রামমোহনকে বাধা দিয়াই সুপণ্ডিত ভবানীচরণ তাঁহার লেখনী ও প্রতিভার অপব্যবহার করিয়াছিলেন।

তথাপি সমসাময়িক ইতিহাসে ভবানীচরণের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। রামমোহনের কোনো জীবনচরিতকারই তাঁহার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেন

নাই। ভবানীচরণ রক্ষণশীলতার সমর্থন করিয়াছিলেন সত্য এবং সেই যুগের ইতিহাসধারায় তাঁহার কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার জীবনেতিহাস ও রচনাবলী গভীরভাবে অনুশীলন করিলে আমরা দেখিতে পাই যে গোঁড়া হইলেও ভবানীচরণ অন্ধ ছিলেন না। আসল কথা, রামমোহনের যুগে বাঙালির সমাজ-জীবনে তখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। দুই দিকে চলিতেছিল দুই বিপরীতধর্মী আত্যন্তিকতা। রামমোহনের স্বচ্ছ দৃষ্টি তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে সেই যুগে সহজসাধ্য ছিল না। তথাপি, এই আত্যন্তিকতার মধ্যেই ইতিহাস সেদিন স্বরূপ আহরণ করিতেছিল,—পরস্পরের সমালোচনা ও ঘাত-প্রতিঘাতে সেদিনকার বাঙালির আত্মদর্শনের পথ হইয়াছিল সহজ ও স্বচ্ছ। ভবানীচরণের স্বতন্ত্র মূল্যও আছে। 'কলিকাতা কমলালয়' এবং 'নববাবু বিলাস'-জাতীয় ব্যঙ্গ-রচনায় তিনি সমাজসন্ধানের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারই হাতে বাংলা গদ্যের এক নবীন ঐতিহ্য নবজন্ম লাভ করিয়াছিল।

'সমাচার দর্পণ'-এর প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী'র আবির্ভাব; আবার 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিপক্ষতার উদ্দেশ্যেই ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ইহাও সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সেকালের হিন্দু-বাংলায় 'চন্দ্রিকা' ও 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক উভয়েই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' নানা সময়ে নানা ভাবে হস্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হইয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কাল পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কৌমুদী'র শেষ পর্যায়ে পুত্র রাধাপ্রসাদ কিছুদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন। অন্যদিকে বাদানুবাদের উত্তেজনাই প্রধান হইলেও 'চন্দ্রিকা'র একমাত্র উপজীব্য ইহা ছিল না। নানাবিষয়ক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনার্তিকে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন এবং পরে উহা হস্তান্তরিত হইয়া আরো পাঁচ বৎসরকাল প্রচলিত ছিল। আর কিছুর জন্য না হউক, অন্তত রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমকালীন বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিযুগের একজন সমর্থশিল্পী হিসাবে এবং অন্যতম সমাজনায়ক হিসাবে ভবানীচরণ আমাদের নমস্য।

ভারতীয় রাজনীতির জনক রামমোহন।
ইতিহাসে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব।
আধুনিক ভারতবর্ষের এ্যারিস্টটল্ তিনি।

রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তারিত আলোচনার তাই প্রয়োজন আছে। প্রথমেই সুরেন্দ্রনাথের একটি কথা উল্লেখ করিব। তিনি রামমোহন সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "For let it be remembered that Rammohan Ray was not only the founder of the Brahmo Samaj and the pioneer of all social reforms in Bengal, but he was also the father of constitutional agitation in India. It is remarkable how he anticipated us in some of the great political problems which are the problems of today." * সুরেন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিলেও, রামমোহন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী ছিলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই রামমোহন-চরিত্রের ভিত্তি। এত বড়ো বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মনীষা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়া সম্ভব হইতে পারে না। রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা সম্পর্কে দুইটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। একটি তাঁহার নিজের, অপরটি তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ সহচর উইলিয়ম এ্যাডামের। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের কণ্ঠ হইতে ভারতবাসী প্রথম শুনিল: "স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোনোদিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কোনোদিন জয়ী হইবেও না।" এ্যাডাম বলিয়াছেন: "রামমোহন হয় স্বাধীন থাকিবেন, নহিলে তাঁহার অস্তিত্বই থাকিবে না। স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার অন্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আবেগ বা প্রবৃত্তি।"

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যখন 'রিফর্ম বিল' আসিল, তখন রামমোহন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন: "এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে আমি ইংলণ্ডের অধিকারে আর থাকিব না। আমার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি আমেরিকাতে গিয়া বাস করিব।" আবার স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন

* *A Nation in Making*: S. N. Banerjea.

রামমোহন আনন্দে কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন। ডিগবি সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অধীনে কাজ করিবার সময়ে রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিতেন। রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা কত গভীর ছিল, তাহা এইসব ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার একটি বহিরঙ্গ লক্ষণই হইল এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা। আবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সার্থক নবজাগরণ কোথায়? বিপ্লবই বা কোথায়?

এইবার আমরা রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব এবং সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বা বিশ্বপথিক রামমোহনের কথাও বলিব। তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে আন্তর্জাতিক রামমোহন রায় স্বাধীনতা ও বিপ্লবের কত বড়ো একজন বন্ধু ছিলেন।

পলাশি যুদ্ধের ফলাফল ভারতবর্ষে বিরাট সমাজবিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। পলাশি যুদ্ধের পনর বছর পরেই রামমোহনের জন্ম। ইংরেজ আসিল, সাম্রাজ্য বসাইল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রবর্তন করিল। রামমোহনের প্রতিভা ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত ভূমিকা যখন উপলব্ধি করিতে পারিল, তখন হইতেই আমরা দেখিতে পাই রামমোহন ইংরেজ রাজশক্তিকে ভারতের কল্যাণকামী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইংরেজ শাসনকে রামমোহন সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজের সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজ জাতি সম্পর্কে তাঁহার মনে উচ্চাশা ও শ্রদ্ধা পর্যন্ত জাগিয়াছিল। রাজার নিজের উক্তির মধ্যেই ইহার স্বীকৃতি আছে। 'খ্রীষ্টান জনসাধারণের নিকট সর্বশেষ আবেদন'-এ রামমোহন ইংরেজ জাতি সম্পর্কে লিখিয়াছেন: "a nation who not only is blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free enquiry into literary and religious subjects, among those nations to which that influence extends."—এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই রামমোহন ইংরেজের আশ্রয়ে ও সাহায্যে ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ, উন্নতির পথ

প্রশস্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তারপর ইংরেজ দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ পণ্ডিতদের রচনা পাঠে ইংরেজদের নাগরিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারবোধের প্রতি, তাঁহাদের বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদী নিষ্ঠার প্রতি রাজার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। ব্রিটিশ আইন, নাগরিক অধিকার, সামাজিক বিধান ইত্যাদি যাহাতে সত্বর ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য হয়, ভারতীয়গণ সেই সব সুবিধান অনুযায়ী সুখশান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে সমর্থ হয়, রামমোহন সেজন্য যত্নবান হইয়াছিলেন।

ইংরেজ-শাসনকে রামমোহন দেখিয়াছিলেন সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। তিনি চাহিয়াছিলেন নূতন পরিবর্তনের ফলে ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে সম্ভাবনা-পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুক, অথবা তাহাকে সেই সুযোগ দেওয়া হউক। এই আশায়ই রামমোহন ভারতে ইংরেজের উপনিবেশ স্থাপনের (Colonisation) স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় টাউন হলে এই বিষয়ে যে সভা হয়, তাহাতে রামমোহন ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, য়ুরোপীয় ভদ্রমহোদয়দের সহিত আমাদের যোগাযোগ যত বেশি হইবে, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাদের তত বেশি উন্নতি হইবে।" রাজার মানসচক্ষে ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল চিত্রই উদ্ভাসিত হইত। কিভাবে ভারতবর্ষ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় ইংলণ্ডের মত সু-উন্নত হইতে পারে রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় এই চিন্তা সর্বক্ষণের জন্য ছিল।

রামমোহন কিজন্য colonisation চাহিয়াছিলেন, ইহা লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ভাবিবার আছে। রামমোহন ও তাঁহার অনুগামীরা বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের সাহচর্যেই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। য়ুরোপীয় অনুপ্রবেশের ফলে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি—কৃষি ও কুটীর শিল্পের সংযোগে গঠিত গ্রামীণ সমাজ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছিল। রামমোহন দেখিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে ইংরেজ শাসকবর্গ কি অমানুষিক হারে ভারতের সম্পদ শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। এই সম্পর্কে রামমোহনের *Paper on the Revenue system of India* স্মর্তব্য। সেখানে তিনি নির্ভুলভাবে

দেখাইয়াছেন যে, "The amount of capital or the aggregate tribute, public and private, so withdrawn from India from 1765 to 1820 was £110,000,000." এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকারকল্পে রামমোহন কি ভাবিলেন তাহাই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই যে capital drain বা মূলধনের ক্ষয়, ইহা যে রোধ করা সম্ভব, সে বিষয়ে তাঁহার কোনো বিশ্বাস ছিল না, কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য রোধ করিবার মতো কোনো শক্তি স্বদেশে আছে বলিয়া তিনি দেখেন নাই বা মনে করেন নাই। দেশের মধ্য হইতে নূতন উৎপাদন-কৌশল যে কেহ গ্রহণ করিতে বা শিক্ষা করিতে পারিবে সে আস্থাও তাঁহার ছিল না। সমশ্রেণীর স্বজাতীয়দের ব্যবহার দেখিয়াই বোধ হয় দেশের মধ্যে নূতন ভাব বা আন্দোলনের শক্তির উপরেও তাঁহার আস্থা ছিল না। কাজেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন বিদেশী শক্তির উপর—এই ক্ষয়ের যাহারা মূল কারণ তাহাদের উপর, নির্ভর করিলেন বিদেশী পুঁজির উপর। বিদেশী শিল্পোৎকর্ষের উপর। সুতরাং তিনি চাহিলেন colonisation বা য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা এই দেশে বসতিস্থাপন। তিনি আশা করিলেন যে, এদেশে বিত্তশালী য়ুরোপীয়গণ বসবাস আরম্ভ করিলে দেশীয় মূলধনের দেশান্তর হ্রাস পাইবে আর বিদেশী মূলধন ও উন্নত উৎপাদন-কৌশলের প্রভাবে দেশের শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। কিন্তু রামমোহনের প্রখর যুক্তিপরায়ণ চিত্তেও এই সত্যটি সেদিন ধরা পড়ে নাই যে, বিদেশী মূলধন যদি স্ব-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া এদেশে আসে, তবে তাহা সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থেই আসিবে, এদেশের উন্নতিকল্পে কখনই আসিবে না। নীল চাষের ইতিহাস ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রামমোহন সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন নাই, কিম্বা করিলেও একাংশে করিয়াছেন, কোনো কোনো সমালোচক ইহা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই মতের অনুবর্তী নই। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি ইংরেজশাসনে শাসনযন্ত্র পরিচালনায় ভারতবাসীর অধিকারের কথা বার বার বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট আবেদন' স্মরণীয়। ইহাতে তিনি বলেন, "মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে হিন্দুগণ মুসলমানদের সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত;

রাষ্ট্রশাসনযন্ত্রের দায়িত্বশীল পদে তাহারা অধিষ্ঠিত হইত এবং অনেকে নবাবের পরামর্শদাতারূপেও নিযুক্ত হইত। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয়গণের রাজনৈতিক অধিকারাদি বিলুপ্ত হইয়াছে।…ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতীয়গণের ঐসব অধিকার মঞ্জুর ও সংরক্ষণ না করেন, তাহা হইলে সুখ-শান্তির যে আশায় ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করিয়াছে, তাহার ভিত্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।” রামমোহন বারবার ঘোষণা করিয়াছেন, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী ভারতীয়দের দায়িত্বশীল সরকারী পদে নিয়োগ ভিন্ন ব্রিটিশ সরকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জন করিতে পারিবেন না।

এই চিন্তা ও দাবীর মধ্যেই রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। আর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বা স্বাতন্ত্র্যবোধকে রক্ষা করার প্রেরণাতেই তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক উদ্যম প্রকাশ পাইয়াছিল। রামমোহন যে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহারও পিছনে ছিল রাজনৈতিক বোধ; কারণ তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে খ্রীষ্টধর্মের বেশ ধারণ করিয়া ভারতীয় জীবন-বিন্যাসের উপর যে আক্রমণ ও তাচ্ছিল্যের স্রোত নামিয়া আসিয়াছিল তাহার পিছনে আছে শাসকের সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি।

রামমোহন আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রনৈতিক গুরু। বিশ্বমৈত্রী এবং সহ-অবস্থানের কথা তাঁহার কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল। সমষ্টি-কেন্দ্রিক কল্যাণবোধের আদর্শ তাঁহারই নিকট হইতে আমরা প্রথম পাইলাম। ইংরেজি শিক্ষার, বিশেষ করিয়া ফরাসী বিপ্লবাদর্শের শিক্ষার প্রবল প্রেরণায় রামমোহন 'Liberty' শব্দের নূতন তাৎপর্য অনুভব করিলেন,—আর সেই তাৎপর্যের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইল তাঁহার 'Equality' এবং 'Fraternity'র আদর্শ। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমষ্টিবন্ধনের যথার্থ মূল্য। ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্যই সাম্য এবং সৌভ্রাত্রের প্রয়োজন। ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্বের মুক্তিই যদি না রহিল, তবে সাম্য ও সৌভ্রাত্র দাঁড়াইবে কোথায়, কাহাকে আশ্রয়

করিয়া? রামমোহন আত্মসচেতন ব্যষ্টিধর্মী মানুষে মানুষে এক নূতন সমষ্টি-জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম 'আত্মীয় সভা'। নবজাগ্রত সমষ্টিবদ্ধ জীবনের অখণ্ড অংশরূপে যে ব্যক্তিধর্মের পরিকল্পনা রামমোহন করিয়াছিলেন, তাহারও পিছনে ছিল য়ুরোপের জাতীয়তাধর্মী স্বাভিমান এবং স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি। এই মর্যাদা ও অভিমানের সচেতনতা লইয়াই তিনি ইংরেজ রাজকর্মচারিকৃত অসদাচরণের বিরুদ্ধে বড়লাটের নিকটে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই আবেদনপত্রের ছত্রে ছত্রে এদেশীয় শাসিত জনসাধারণের সদাচরণ প্রাপ্তির অদম্য দাবী জোরের সহিত প্রতিফলিত হইয়াছে। বস্তুত উনিশ শতকের ভারতের প্রথম মুক্তিদূত রামমোহন একটি সমষ্টিবদ্ধ জাতির প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন—যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি স্বয়ং-স্বতন্ত্র নাগরিক হিসাবে স্বাধীন, সুস্থ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। প্রবল সামাজিক অসাম্য এবং উৎপীড়নের পট-ভূমিতে রামমোহনের জন্ম। তাই রামমোহনের স্বয়ং-স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রবলতম সংগ্রাম-অভিযান ছিল সেই সমাজের অনৈক্য আর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। আমাদের মনে রাখা উচিত, রামমোহন তথাকথিত একজন সংস্কারক মাত্র নহেন—তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী সংস্কারক—মার্টিন লুথারের মতনই আপোষহীন, দুর্ধর্ষ, দুরন্ত। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও আমরা সেই একই রামমোহনকে দেখিতে পাই। ইংরেজ ভাল—এই কথা তিনি নির্বিচারে মানিয়া লন নাই; ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের শাসন তাঁহার দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে, ইহা মনে করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। শাসকের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিবার জন্য রামমোহন কোনোদিন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ান নাই—দাঁড়াইয়াছিলেন আপন মানব-মর্যাদায়।

ইহাই প্রকৃত বিপ্লবীর লক্ষণ। রামমোহনের ছিল প্রখর ইতিহাস-সচেতন মন। তিনি জানিতেন ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা চলে, পরিবর্তিত করিতে পারা যায় না। সেই ইতিহাসের প্রবাহধারায় অবগাহন করিয়াই রামমোহন তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা দ্বারা ভারতে ইংরেজশাসনের সম্ভাবনার তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম আবশ্যক রাজনৈতিক ঐক্য। ইহার

দ্বারাই ভারতবর্ষ একদিন তাহার হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে, ইংরেজশাসনের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া রামমোহন সেই ঐক্যকে ভারতবাসীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। যখনই রামমোহন ইংরেজের শাসনে ন্যায়বিচারের অভাব দেখিয়াছেন, তখনই তিনি শাসককে সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি রামমোহন কোনোদিনই আনুগত্য জ্ঞাপন করেন নাই; ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রামমোহন যে পরামর্শ দেন, এদেশবাসী ইংরেজ রাজকর্মচারীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য রাজা যে দাবী জানান এবং ব্রিটিশ আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে সব সুপারিশ করেন, তাহার মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য ছিল, ভারতবর্ষ যেন ইংরেজের কুশাসনে নিগৃহীত না হয়, তাহার উদ্ধত রাজকর্মচারীর দুর্ব্যবহারে লাঞ্ছিত না হয়, যেন ব্রিটিশ সামাজিক আইনের সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণ হইতে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় প্রজা বঞ্চিত না হয়। দেশে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর শাসকের প্রথম আঘাত নামিয়া আসিল, রামমোহন উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার ইহাই পটভূমি।

রামমোহনের রাজনৈতিক জীবনে সাংবাদিক রামমোহনের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। আগেই বলিয়াছি তিনি দুইখানি সংবাদপত্র, বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী' ও ফার্সিতে 'মিরাৎ-উল্-আখবার্' প্রকাশ করিয়া জনমত গঠন ও জনকল্যাণ সাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বহু বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও, রাজনীতিই ছিল এই পত্রিকা দুইখানির মুখ্য বিষয়। দেশের লোককে তিনি রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রথম পাঠ ইহারই মাধ্যমে দিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং এই কাগজ দুইখানির বিষয়ে আরো কিছু বলা দরকার।

রামমোহন কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন দুইটি উদ্দেশ্যে—প্রথম, বিদেশী গভর্ণমেণ্টকে জনকল্যাণকল্পে অনুরোধ ও কর্তব্য নির্দেশ; দ্বিতীয়, দেশের লোকের মনেও ঐ বোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবার প্রয়াস। তাই সেদিনের

বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। রামমোহন জ্ঞানসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। শিক্ষায়, ধর্মে, সমাজ-সংস্কারে তাঁহার চিন্তা ও কর্ম দুই-ই সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছিল। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার একদিকের পরিচয় বহন করিতেছে বাংলা ভাষায় সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম জাতীয় সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'। বলিয়াছি, কাগজ করিবার মূল প্রেরণা ছিল জনকল্যাণ অর্থাৎ Public welfare এবং এ-ক্ষেত্রেও রামমোহন আমাদের পথপ্রদর্শক। 'কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যায় (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২১) পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া রামমোহন লিখিলেন :

"বাংলা প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলা সংবাদপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী'র স্বত্বাধিকারিগণ সসম্মানে জানাইতেছেন যে এই কাগজের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ।...এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়া হইল, তাহা পড়িলেই আমাদের দেশবাসিগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, যদিও আমরা ইহা পরিচালনা করিব (সুতরাং ইহা আমাদেরই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে), তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা জনসাধারণের পত্রিকা, যেহেতু যে কোনও জনকল্যাণকর বিষয়ে দেশবাসিগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ইংরেজি ভাষায় ছাপাইয়া প্রতিকার না পাইলে, তাহা এই পত্রিকায় ছাপাইতে পারিবেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, রামমোহন যখন প্রথমে ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার যাবতীয় পুস্তকাদি ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ছাপা হইত। পরে পাদ্রীদের সহিত বিরোধ যখন প্রবল হয়, তখন ব্যাপটিস্ট মিশনের মিশনারিগণ তাঁহাদের ছাপাখানায় রামমোহনের পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। রামমোহন তখন নিজেই প্রেস করিলেন, কয়েকজন লোককে ছাপাখানার কাজ শিখাইলেন। কাগজ করিবার সময়ে তাঁহার নিজস্ব প্রেস খুব সহায়ক হইয়াছিল।

রামমোহন কাগজ করিয়াছিলেন ব্যবসায় করিবার জন্য নহে। রামমোহনের এক জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন : "প্রথম সংখ্যায় বলা হইয়াছিল যে দেশের কল্যাণের জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে। উহাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন উহাতে লর্ড হেস্টিংস যে পরিমাণে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, অন্যান্য পত্রিকায় পারস্য, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত অনুবাদযোগ্য প্রবন্ধ ইহাতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইবে।" বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি ও সামাজিক নীতি-বিষয়ক সংবাদ—এই সবই থাকিত 'সম্বাদ কৌমুদী'তে।

'সম্বাদ কৌমুদী'র গৌরব স্বতন্ত্র। বাংলা ভাষায় বাঙালির দ্বারা পরিচালিত ইহাই প্রথম সংবাদপত্র। পরবর্তীকালে বাঙালি মানসের জাগরণে অক্ষয়-কুমারের 'তত্ত্বোধিনী' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে কাজ করিয়াছিল, সে যুগে রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' তাহাই করিয়াছিল। এ-ক্ষেত্রেও রামমোহনের অগ্রজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রাজার দ্বিতীয় পদক্ষেপ 'মিরাৎ-উল্-আখবার্'। 'কৌমুদী' সর্বসাধারণের কাগজ, 'মিরাৎ' কেবলমাত্র শিক্ষিতদের জন্য। ইহার বাংলা নাম 'সমাচারদর্পণ'। সংবাদ ও সমাচার একার্থবোধক শব্দ; সুতরাং পত্রিকা দুইখানির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় একই ছিল বলিতে হইবে।

ভারতবর্ষে নয়, পারস্যেও 'মিরাৎ'-এর সমাদর ছিল। ফার্সি ভাষায় কাগজ বাহির করিবার আরো একটি কারণ ছিল। তখন কলিকাতায় ফার্সি ভাষায় একখানি পত্রিকা ছিল না, অথচ নাগরিকদের একটি বৃহৎ অংশ এবং বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের অধিবাসিগণ তখনো পর্যন্ত এই ভাষায় পঠন-পাঠন করিত। দেশের চারিদিকে, ভারতবর্ষের বাহিরে প্রতিদিন কি ঘটিতেছে, দেশের লোককে তাহা জানাইবার জন্য রামমোহনের ব্যগ্রতার সীমা ছিল না। যখন আমরা কল্পনা করি, অন্ধকারাবৃত ভারতবর্ষে জ্ঞানের জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া একাকী চলিয়াছেন ভারতপথিক রামমোহন—প্রহরে প্রহরে জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় ঘুমন্ত অসাড় জাতিকে হাঁক দিয়া চলিয়াছেন একাকী একজন মানুষ—যে মানুষ নিজের স্বার্থ চিন্তা করিলেন না, রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আর পাঁচজন বিত্তবান বাঙালির মতন নিশ্চিন্ত আলস্যে গতানু-গতিকতার রোমন্থন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন না—যিনি পরিবারের গণ্ডির বাহিরে আনিয়া বৃহত্তর মানব-পরিবারকে আপন জ্ঞান করিলেন, তাহাদের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিলেন, পরিশ্রম করিলেন,

সংগ্রাম করিলেন, তখন সেই যুগমানব, সেই নিখিল মানবপ্রেমিক রাজা রামমোহন রায়ের চারিত্রিক মহত্ত্ব আমরা কিছুটা অনুভব করিতে পারি।

'মিরাৎ' বাহির হইল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। 'কৌমুদী' বাহির হইত প্রতি মঙ্গলবারে, 'মিরাৎ' প্রতি শুক্রবারে। এই দ্বিতীয় সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে রামমোহন পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন: "My only object is that I may lay before the public such articles of intelligence as may increase their experience and tend to their social improvement, and that to that extent of my abilities, I may indicate to the Rulers a knowledge of the real situation of their subjects, and make the subjects acquainted with the established laws and customs of their Rulers, that the Rulers may more readily find an opportunity of granting relief to the people, and the people may be put in possession of the means of attaining protection and redress from their Rulers." 'মিরাৎ'কে অভ্যর্থনা জানাইয়া বাকিংহাম তাঁহার 'জার্ণালে' (২০ এপ্রিল, ১৮২২) সম্পাদকীয় লিখিলেন:

"The Editor is a Brahmin of high rank, a man of liberal sentiment, and by no means deficient in loyalty, well-versed in the Persian language and possessing a competent knowledge of English; intelligent with a considerable share of general information and an insatiable thirst after knowledge." একটি ব্যাপারে 'মিরাৎ' অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাহা এই।

আয়ার্ল্যাণ্ডে সেই সময়ে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ চলিয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, রামমোহন কলিকাতায় বসিয়া পৃথিবীর বিশেষ করিয়া য়ুরোপের সকল সংবাদ রাখিতেন; বহু সূত্র হইতে প্রাপ্ত বিদেশী সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন পরম আগ্রহের সহিত তিনি পড়িতেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের সংবাদে তিনি স্বভাবতঃই বেদনা অনুভব করিলেন। মৌখিক বেদনা প্রকাশ রামমোহনের প্রকৃতি

বিরুদ্ধ। 'মিরাৎ'-এর এক সংখ্যায় আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন এবং ঐ দুর্ভিক্ষে অর্থসাহায্যের জন্য তিনি কলিকাতায় ইংরেজ ও সম্ভ্রান্ত বাঙালির নিকট এক আবেদন জানাইলেন। রামমোহনের আবেদন ব্যর্থ হয় নাই। এদেশীয় অনেক ইংরেজ ও দেশবাসী অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

'মিরাৎ' ছিল সর্বভারতীয় পাঠকদের জন্য। ইহার প্রতি সংখ্যাতেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যার সূচীতেই দেখিতেছি পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের কার্যাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রাশিয়ার সংবাদ, চীনের সংবাদ ইত্যাদি রাজনীতি, শিক্ষা ও শাসন-সংক্রান্ত বহু প্রকার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। রামমোহনের সমসাময়িক ভারতে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইলেন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ। রামমোহনের জন্মের আট বৎসর পরে ইহার জন্ম। রামমোহন দূর হইতে রণজিৎ সিংহের কার্যাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেন এবং কথিত আছে, কোনো এক সময়ে তিনি পত্র দ্বারা রণজিৎ সিংহের সহিত সখ্য স্থাপনের উদ্যোগও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া রামমোহনের সেই পত্র রণজিৎ সিংহের দরবারে পৌঁছায় নাই। রামমোহনের রাজনৈতিক প্রতিভা যদি সেই সময়ে রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রতিভার সহিত মিলিত হইতে পারিত তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এক স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিত, এমন অনুমান খুব অসঙ্গত নয়।

রামমোহন ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বিরোধ দেখিতেন না। ধার্মিক লোক রাজনীতির চর্চা করিবে না, এমন অদ্ভুত ও অসঙ্গত কথা তিনি মানিতেন না। এইখানেই মনে পড়ে তাঁহার সেই অবিস্মরণীয় উক্তি—'ধর্ম যদি ঈশ্বরের হয়, রাজনীতি কি শয়তানের?' সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সবই প্রয়োজন ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি—ইহাদের অনুশীলনের ভিতর দিয়াই তো মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইবে। রামমোহন ইহা মনেপ্রাণে, কর্মে ও

চিন্তায় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া ধর্ম ও রাজনীতি উভয়কেই ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। ধর্ম ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা দেখিতে পাই রামমোহন তেমনি অদ্বিতীয় নেতা। সমকালীন ভারতবর্ষে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল তিনিই। বলা বাহুল্য, এইভাব রামমোহনের মধ্যে শৈশবকাল হইতেই প্রবল ছিল—হয়ত বা এই ভাব লইয়াই তাঁহার জন্ম।

এইবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহনের অতুলনীয় কর্মক্ষমতার কথা বলিব। স্বৈরাচারী গভর্ণমেণ্ট কোনোদিনই বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিতে পারে না। রামমোহনের 'মিরাৎ'-কে ইংরেজেরা খুব প্রীতির চক্ষে দেখিত না। কিন্তু হেষ্টিংস যতদিন ছিলেন, ততদিন কিছু গোল বাধে নাই। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন এ্যাডাম ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল। তখন কলিকাতায় 'ক্যালকাটা জার্নাল' নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বৎসরই হেষ্টিংস মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 'জার্নাল' কলিকাতায় বেসরকারী ইংরেজদের মুখপত্রস্বরূপ ছিল। পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন মিঃ জেমস সিল্ক বাকিংহাম এবং তাঁহার সহকারী ছিলেন মিঃ আর্ণট। বাকিংহাম নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের শাসনকার্যে কিছুমাত্র ত্রুটি দেখিলেই তাহার কঠিন সমালোচনা করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে অনেকবার সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বাকিংহাম ইহা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। সাংবাদিক বাকিংহামের এই নির্ভীকতা তাঁহাকে রামমোহনের খুব প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং তিনি রামমোহনের অন্যতম বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের একটি কাজের বিরুদ্ধে 'ক্যালকাটা জার্নালে' একটি সমালোচনা বাহির হয়। গভর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ ঐ কাগজ বন্ধ করিয়া দেন এবং উহার সম্পাদকদ্বয়কে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার আদেশ করেন। এই ঘটনার পরই অস্থায়ী গভর্ণরজেনারেল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিয়া একটি আদেশ প্রচার করেন। রামমোহন তাঁহার 'মিরাৎ' পত্রে ইহার সমালোচনা করিলেন।

বাকিংহাম-সংক্রান্ত ঘটনাটি সংক্ষেপে এই। ১৮২২-এর জুলাই মাসে জনৈক ডাঃ জেমসন মেডিক্যাল স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। এই ভদ্রলোক তখন অন্য তিনটি পদে কাজ করিতেছিলেন। ইনি যথাক্রমে মেডিক্যাল বোর্ডের সেক্রেটারি, কমিটি ফর কণ্ট্রোলিং দি এক্সপেনডিচার অব স্টেশনারি ও ফ্রী স্কুলের সার্জন। একই ব্যক্তি একসঙ্গে চারিটি পদে নিযুক্ত থাকিবেন—ইহা কিরূপ কথা? বাকিংহাম মন্তব্য করিলেন, 'Pluralism was the Government's shameless method of favouring their friends.' এবং তিনি ডাঃ জেমসনের যোগ্যতার প্রশ্নও তুলিলেন। এই মন্তব্যটিতে গভর্ণমেণ্ট বাকিংহামের উপর বিরূপ হইলেন। কিন্তু তখন 'জার্নালে'র সম্পাদককে মৃদু তিরস্কার করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ঘটনাটি হেস্টিংসের আমলে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখন হইতে গভর্ণমেণ্ট বাকিংহামের কাগজের উপর কড়া দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল এ্যাডামের আমলে বাকিংহাম আবার এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। স্কটল্যাণ্ড গির্জার ধর্মযাজক ডাক্তার স্যামুয়েল জেমস ব্রাইস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বার্ষিক ছয়শত টাকা বেতনে একটি চাকরি গ্রহণ করেন। এ্যাডাম সাহেবই তাঁহাকে ঐ পদে নিয়োগ করেন। 'ক্যালকাটা জার্নাল' এই সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, উপাসনালয়ের প্রধান আচার্যের পক্ষে কাজটি অনুপযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ লেখার ফলে বাকিংহামকে গভর্ণমেণ্ট এইবার রেহাই দিলেন না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

বাকিংহামের উপর বিতাড়নের আদেশ সম্পর্কে রামমোহন তাঁহার 'মিরাৎ'-এর একটি সংখ্যায় চমৎকার একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। সেই মন্তব্যের শেষে তিনি একটি ফার্সি কবিতার দুই চরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্যটি এই: বাকিংহামের উপর সরকারী বিতাড়নের আদেশ সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। নাইল নদীর ধারে জনৈক হস্তীরক্ষক একটি কবিতা বার বার উচ্চারণ করিত—আমার সেই কবিতাটি আজ বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে। কবিতাটি এই: 'তোমার পায়ের তলায় পিপীলিকার অবস্থা যে কি রকম তাহা যদি তুমি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই হাতীর পায়ের তলায় তোমার অবস্থা কি হইতে পারে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতে।'

নূতন আদেশে বলা হইল : "এখন কোনো ব্যক্তি কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রধান সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সকৌন্সিল গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।" রামমোহন দেখিলেন স্পষ্টতই এই আদেশ দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইল। তখন এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট গ্রাহ্য করিতেছেন, ততদিন গভর্ণর-জেনারেলের কোনো ব্যবস্থা বা আদেশ আইন বলিয়া গণ্য হইবে না। রামমোহন ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এ্যাডামের অর্ডিনান্স যাহাতে আইনে পরিণত না হইতে পারে তাহার জন্য রামমোহন সচেষ্ট হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি আবেদন উপস্থিত করিলেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ছয়জন : রামমোহন রায়, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। আবেদনপত্র পাঠান হইয়াছিল ১৮২৩, ৩১শে মার্চ। সুপ্রীম কোর্ট এই আবেদন উপেক্ষা করিয়া গভর্ণর-জেনারেলের অর্ডিনান্সকে আইনে বিধিবদ্ধ করিলেন। রামমোহন নিরস্ত হইলেন না। সুপ্রীম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে রাজার নিকট এক আপীল পাঠাইলেন। এই আপীলেও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন চতুর্থ জর্জ। ইংরাজের ন্যায়বিচারে তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি উহা করিয়াছিলেন। ভারত হইতে বিতাড়িত বাকিংহাম স্বয়ং সেই আপীল লইয়া বিলাতে পার্লামেণ্টে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে আপীলও অগ্রাহ্য হইল।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রামমোহনের এই আবেদন ও আপীলের তুলনা নাই। রাজনীতি, সাহিত্য, ভাষা বা প্রতিভা, যেদিক দিয়াই ইহাদের আলোচনা করা যায়, এমন সুলিখিত, যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিতাময় রচনা সেদিনও যেমন, আজো তেমনি বিরল। একদা ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টায় মিলটন কলম ধরিয়াছিলেন এবং কবির 'এরিওপ্যাজিটিকা' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আজো ইংলণ্ডের সাহিত্যে অতুলনীয় হইয়া আছে। রামমোহনের জীবনচরিত-লেখিকা মিস কলেট রামমোহনের এই আবেদনখানি ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'এরিওপ্যাজিটিকা' বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে রচনা-প্রণালী ও যুক্তিবিন্যাসের দিক দিয়া রামমোহনের রচনা মিলটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মিস কলেট এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "রামমোহন যেসব ইংরেজি রচনায় তাঁহার হস্ত নিয়োগ করিয়াছেন তাহার ভিতর এইটি অতি উৎকৃষ্ট; ইহার ভাষামাধুর্য ও উচ্চ ভাব একশত বৎসর পূর্বেকার শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

ইংলণ্ডের রাজদরবারে আবেদন অগ্রাহ্য হইল। ইংরেজের ন্যায়বিচারে আস্থাবান রামমোহন স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইলেন। পরাধীন জাতির মনের ক্ষোভ তিনি স্বতন্ত্র উপায়ে—সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করিলেন। ১৮২৩-এর ৪ঠা এপ্রিল 'মিরাৎ'-এর এক বিশেষ সংখ্যায় একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি কাগজ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন:

"আব্রু কে বা-সদ্ খুন-ই-জিগর দস্ত দিহদ্
বা-উমেদ-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা ফরোশ।"

অর্থাৎ—যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোনো অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

সাংবাদিক রামমোহন আত্মসম্মান বিক্রয় করেন নাই, অনুগ্রহ ভিক্ষা করেন নাই। এই ভাবেই তিনি সেদিন সাংবাদিকতার গৌরব তুলিয়া ধরিয়া জাতিকে রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। রামমোহনের এই উত্তরাধিকার আমরা কি অর্জন করিতে পারিয়াছি?

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রামমোহনের সাংবাদিক প্রয়াস 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'মিরাৎ-উল্-আখবার্'এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রামমোহন সমকালীন বহু পত্রিকায় 'য়্যান অবজার্ভার,' 'এ ফ্রেণ্ড টু রিফর্ম' প্রভৃতি বিভিন্ন ছদ্মনামে অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার নানা ব্যাপারে তাঁহার নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করিতেন। 'মিরাৎ' বন্ধ হইয়া যাইবার পর রামমোহন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে *Bengal Herald* নামে আর একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত এই নূতন পত্রিকার 'মটো' হিসাবে তিনি অনুষ্ঠানপত্রের শিরোনামায় 'সিসেরো'র এই বাণীটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন: 'Liberty consists in the power of doing that which is permitted by Justice.' 'বেঙ্গল হেরাল্ড'এর

উদ্যোক্তাগণের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন আর, এম, মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরতন হালদার ও রাজকিষণ সিং। 'বঙ্গদূত' নামে 'হেরাল্ড' পত্রিকার একটি বাংলা সংস্করণও রামমোহন প্রকাশ করেন। এই দুইখানিই ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই 'বঙ্গদূত'-এর ১৩ই জুন-এর সংখ্যায় 'গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি'-শীর্ষক আলোচনায় রামমোহন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে যেসব সামাজিক সুফল ঘটিতে পারে, সেই বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন।

॥ তেরো ॥

দেশের হইয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করিবার জন্য রামমোহন আর একটি পদক্ষেপ করিলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই বৎসরের গোড়ার দিকেই 'জুরি আইন' পাশ হইল। রামমোহন দেখিলেন, এই আইন স্পষ্টত বিচারকার্যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিবে এবং সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। আইনে বলা হইল, কোনো হিন্দু কি মুসলমান 'জুরার' দেশীয় কি বিদেশীয় কোনো খ্রীষ্টানের বিচার করিতে পারিবে না; কিন্তু খ্রীষ্টান 'জুরারে'র পক্ষে ঐরূপ কোনো বিধিনিষেধ থাকিবে না। এমন কি, দেশীয়দের বিচারসময়েও কোনো হিন্দু কি মুসলমান 'গ্র্যাণ্ড জুরি'তে বসিবার অধিকার পাইবে না। নবপ্রবর্তিত 'জুরি আইন' রামমোহন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেন। আইনশাস্ত্রে রামমোহনের প্রতিভা এইবার প্রকাশ পাইল। আইনের প্রত্যেকটি ধারা এবং সমাজ-জীবনে ইহার কি ফল হইতে পারে তাহা তিনি বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই আইন সম্পূর্ণভাবে দেশের কল্যাণের পরিপন্থী। শাসকের আইন করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেই আইন শাসিতের পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—ইহাই ছিল রামমোহনের চিন্তাধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিবাদের অস্ত্র রাজার কলমে শাণিত হইল—যথাসময়ে তিনি এই অন্যায় বিধানের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। আবেদনলিপি প্রস্তুত হইল এবং তাহাতে বহু হিন্দু ও মুসলমান স্বাক্ষর দিলেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি করিতে রামমোহন দক্ষ ছিলেন। ইংলণ্ডের মহাসভায় এই আবেদন-পত্রখানি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল।

রামমোহনের কার্যপদ্ধতি ছিল নিখুঁত। মিঃ জে. ক্রফোর্ড নামক জনৈক প্রভাবশীল ইংরেজের নিকট ঐ আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয় এবং তিনিই উহা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করেন। এই আবেদনপত্রে রামমোহনের যুক্তি প্রণালী দেখিয়া ইংলণ্ডের বহু আইনজ্ঞ ব্যক্তি পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। রাজা আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে,

সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টির কুফলের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ইংরেজের নিজের দেশেই রহিয়াছে। ভারতে তাহার পুনরুক্তি করা শাসকদের পক্ষে অত্যন্ত ভুল হইবে। এই আবেদনপত্রখানিও রামমোহনের তীক্ষ্ণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি, রাজনৈতিক প্রতিভা এবং স্বদেশপ্রীতির আর একটি মূল্যবান দলিল। ইহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

"যে সুসভ্য ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার পক্ষপাতী ও জ্ঞান প্রচারের এত উৎসাহদাতা, ভারতবাসী অর্ধশতাব্দী তাঁহাদের দ্বারা শাসিত হইতেছে; কিন্তু তাহাদের মনোভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং তাহাদের কোন মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া গভর্ণমেণ্ট আইন ও বিধান প্রণয়ন করেন। সেইজন্য ইংরেজশাসনে ভারতের কল্যাণ হইবে ভাবিয়া যাঁহারা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত তাঁহাদের সহিত আমিও গভীর বেদনা অনুভব করিতেছি।"

জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ রামমোহনের এই দলিলেই আমরা পাইতেছি। শুধু তাহাই নহে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ যে সব রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে আশা করে, আজ হইতে একশত বৎসরেরও কত পূর্বে তাঁহার দেশবাসীদের জন্য রামমোহন সেইসব অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন নাই, ভারতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জনক রামমোহন।

বাংলাদেশে বহুকাল হইতে দায়ভাগ প্রচলিত। সহসা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি গ্রে সাহেব মিতাক্ষরা আমদানী করিয়া বসিলেন। তিনি এই মর্মে রায় দিলেন, 'পুত্র অথবা পৌত্রের বিনা অনুমতিতে কেহ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিবে না।' ইহা রামমোহনের ইংলণ্ড গমনের বৎসরের ঘটনা। তিনি গ্রে সাহেবের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলেন এবং এ-বিষয়ে ইংরেজিতে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। এই জাতীয় রচনায় রামমোহন ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং স্বদেশে ও বিদেশে কত বিষয়ে তিনি যে কত *tract* রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা আজও

সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। এই প্রবন্ধে রামমোহন যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার হিন্দুদের বিশেষ অনিষ্ট হইবে এবং দায়ভাগ অনুসরণ করাই বাংলার পক্ষে বিধেয়। পুস্তিকা প্রকাশ ব্যতীত, 'হরকরা' পত্রেও তিনি এ-বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ পত্রাকারে প্রকাশ করেন। কলিকাতায় রামমোহনের পনর বৎসরকালব্যাপী কর্মজীবনে তৎকালীন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় রামমোহন স্বনামে ও ছদ্মনামে যে কত পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারই বা কে ইয়ত্তা করিবে? ইহা হইতেই আমারা ধারণা করিতে পারি রামমোহনের মন, মস্তিষ্ক ও কলম কি পরিমাণে সক্রিয় এবং সবল ছিল। চলমান সমাজ-জীবনে যখন যে সমস্যা আসিয়াছে, অমনি তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন এবং সেই সমস্যা সমাধানের অভ্রান্ত নির্দেশও দিয়াছেন। পরবর্তীকালে একমাত্র বিদ্যাসাগর ভিন্ন আর কেহই এ-ক্ষেত্রে রামমোহনের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না।

'হরকরা'য় প্রবন্ধ লিখিয়াই রামমোহন ক্ষান্ত হইলেন না। গ্রে সাহেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিলেন। সুপ্রীম কোর্টের নিষ্পত্তি রহিত হইয়া গেল। জাতির শিয়রে এইভাবেই ছিল তাঁহার অতন্দ্র জাগরণ, এইভাবেই তিনি ইহার কল্যাণের সকল পথ সর্বদা সুরক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইতেন। রামমোহন যুগমানব এবং দেশনায়ক শুধু চিন্তায় নয়, কর্মেও।

কর্মজীবনে রামমোহনের এক মুহূর্তেরও নিশ্চিন্ত অবসর ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে তাহার শাসনযন্ত্র ও শোষণযন্ত্র কায়েম করিয়া চলিয়াছে এবং যখনই সুবিধা বুঝিয়াছে তখনই ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেশের লোক একরকম চক্ষু বুজিয়া থাকিত—মুসলমান তথা নবাবী আমল হইতেই এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। সেই চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রায় ব্যতিক্রম একমাত্র রামমোহন। ইংরেজ নূতন শাসক এবং বিদেশী শাসক। ইহার শাসনে ভারতবাসীর কল্যাণ হইবে, রামমোহন এই আশা মনের মধ্যে পোষণ করিলেও, তিনি সর্বদা হুঁসিয়ার ছিলেন, শাসক যেন শাসিতের কল্যাণের পরিপন্থী, উন্নতির পরিপন্থী কিছু করিতে না পারে। যখনই করিতে উদ্যত

হইয়াছে, রামমোহন শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের কথা তুলিয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই। ইহারই আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল।

রামমোহন কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাশ হইল। এই রেগুলেশন অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নিষ্কর জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব কাড়িয়া লইবার অধিকার দেওয়া হয়। এই অধিকারের বলে অসংখ্য মালিককে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হয়। রামমোহন দেখিলেন, ইহা প্রজার অর্থনৈতিক অধিকারে স্পষ্ট হস্তক্ষেপ। রামমোহন অমনি সর্বস্বান্ত ভূ-স্বামীদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের লইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকটে একটি আবেদনপত্রে রেগুলেশনটি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। বেণ্টিঙ্ক উহা গ্রাহ্য করিলেন না।

রামমোহন বিলাতে আপীল করিলেন। 'দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।' জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আমরা জানি রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে স্বীয় মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমির উন্নতির প্রতি জমিদারগণ সচেতন হইবেন। আবার তিনি এই বন্দোবস্তের দুর্বলতার দিকটিও দেখাইয়া লিখিয়াছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদিগকে যে একতরফা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই বাংলার কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমিদারগণ ইহার সুযোগ লইয়া যখন খাজনা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখনই কৃষকবন্ধু রামমোহন বলিয়াছিলেন—সরকারের পক্ষ হইতে কৃষকদিগের উপর করভার লাঘব করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে রামমোহন এদেশীয় কৃষকদের নিত্য-দুর্দশার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

য়ুরোপীয় সহবাসে যে ভারতবর্ষের প্রভূত উন্নতি হইবে, এই সত্য রামমোহন জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ ইহা লইয়া রামমোহনের দূরদৃষ্টির বিশেষ প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনীকারগণ এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যে উদারমনা ইংরেজদের সাহচর্যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই বিষয়ে মনে হইয়াছিল যে ইংরেজ-শাসনেও ঠিক এই ধরনের উন্নত অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে। য়ুরোপের শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে যে আশাবাদের সুর ছিল রামমোহনকে তাহা বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন এই প্রভাব জনগণের মধ্যে প্রকাশিত হউক যাহার ফলে তাহারা ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করুক যে, কি উপায়ে য়ুরোপীয় জাতিগোষ্ঠী সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কারের কবল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে পৌঁছিয়া রিফর্ম-বিল সম্বন্ধে আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

রামমোহন বুঝিয়াছিলেন য়ুরোপের সমদক্ষতা লাভ করিতে হইলে শিল্প-বিপ্লবের সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করা কর্তব্য। তথাপি তিনি স্বয়ং ইহার গোড়াপত্তন করেন নাই। তখনকার দিনে আর একজন মনীষী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই কাজে অগ্রণী হন। তিনি অবশ্য ইহাতে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্যর্থতার মধ্য দিয়া ভাবীযুগের শিল্পের পত্তন হইয়াছিল, এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নাও হইতে পারে। য়ুরোপীয় বণিকদের স্বার্থান্ধতার ফলে এদেশে দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণ তাঁহারা কোনোদিন সুনজরে দেখেন নাই। রাজার অর্থনৈতিক চিন্তার অনেকখানি তাঁহার সুযোগ্য অনুগামী দ্বারকানাথের বহুমুখী শিল্প-প্রয়াসের ভিতর দিয়া কিভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে রামমোহন যদি জাতীয়তার ভিত্তি রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে এদেশে শিল্প-বিপ্লবের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন এবং ইহা করিতে গিয়া তাঁহার প্রায় এককোটি টাকার উপর দেনা হয়। দেনা করিয়াও দ্বারকানাথ বাঙালিকে ব্যবসা করিবার, ইনডাষ্ট্রি করিবার কথা শিখাইয়া গিয়াছেন।

এইবার আন্তর্জাতিক রামমোহনের কথা বলিব।

রাজার এক চরিতকার লিখিয়াছেন: "রামমোহন রায়ের চিত্ত কেবল স্বদেশের রাজনৈতিক চিন্তায় বদ্ধ ছিল না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক উন্নতির বিষয়ে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি ছিল।" আমরা দেখিয়াছি রংপুর হইতেই রামমোহন অত্যন্ত যত্নের সহিত বিদেশী সংবাদপত্র পাঠ করিতেন এবং য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অবগত হইতেন। রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি ছিল দুইটি, Truth ও Justice—সত্য এবং ন্যায়। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো জাতির রাজনৈতিক উদ্যমের মধ্যে যখনই তিনি ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিতে পাইতেন, অমনি তাঁহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিত। এই বিশ্বমানবতাবোধ সেদিন পৃথিবীতে এই একটি মানুষেরই ছিল।

কলিকাতার মাণিকতলার বাড়ি হইতেই রামমোহন সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় সমস্ত পৃথিবীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার পদ্ধতি ছিল সুন্দর। তিনি ভারতের বাহিরে য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট নিজের পুস্তিকাদি পাঠাইতেন। এইভাবে তিনি দেশ-বিদেশে চিঠি লিখিয়া ও স্বরচিত পুস্তিকা প্রচার করিয়া যোগাযোগ স্থাপন করিতেন। রামমোহনের পুস্তিকা প্রভৃতি প্রচারের ফলে তখনকার দিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাজগতের উপর যে ভারতীয় চিন্তাধারার একটা গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল, কিছুকাল পূর্বে বিদুষী মার্কিন মহিলা (নাম শ্রীমতী এড্রিয়েন মুর) তাঁহার পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। রামমোহনের সমকালীন পৃথিবীতে আমেরিকা ও য়ুরোপের বহু দেশে চলিয়াছে আন্তর্জাতিক চেতনার জাগরণ। কলিকাতায় বসিয়াই তিনি এইসব বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেন। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, "এই বিরাট সংগ্রামী বসুন্ধরার বীর্যরসপূর্ণ স্তন্যপানে রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার পুষ্টি ও বৃদ্ধি। তাই রামমোহন চিরজীবন স্বাধীনতা-প্রাণ, বিপ্লবীর বন্ধু এবং সমগ্র এশিয়ার সর্বপ্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বোধসম্পন্ন নবযুগের পথদ্রষ্টা ও পথস্রষ্টা।"

রামমোহন যখন কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করিয়াছেন তখন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাব্যাপী বিরাট স্পেনীয় উপনিবেশ-সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়াছে। তারপর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার কলোনিগুলি যেদিন স্পেনের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল, সেদিন ভারতবর্ষে একমাত্র রামমোহনই সেই স্বাধীনতাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি টাউন হলে স্বীয় ব্যয়ে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। আবার সেই একই বৎসরে যখন অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদল নেপলস্-এর স্বাধীনতা-সংগ্রামের গলা টিপিয়া ধরিল, তখন দুঃখে, ক্ষোভে রামমোহন 'ক্যালকাটা জার্নাল'-সম্পাদক ও তাঁহার বন্ধু বাকিংহামকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন: "নেপলস্‌বাসীদের দাবী আমার নিজের দাবী বলিয়া মনে করি, তাহাদের শত্রুদের নিজের শত্রু বলিয়া গণ্য করি। স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের মিত্ররা কোনো দিন জয়ী হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত কোনো দিন জয়ী হইবেও না।" রামমোহনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার-চেতনা কত প্রবল ছিল তাহা এই পত্রাংশে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলিবার আছে। ১০ই আগষ্ট, (১৮২১) কলিকাতায় নেপলস্‌বাসীদের পরাজয়ের সংবাদ আসিল। পরদিন ১১ই আগষ্ট সন্ধ্যায় বাকিংহামের ভবনে রামমোহনের একটি নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু এই সংবাদে তিনি এমনই অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, ঐ নিমন্ত্রণ বাতিল করিয়া দিয়া তিনি বাকিংহামকে ঐ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নেপলস্‌বাসীদের এই স্বাধীনতা অর্জনের সাধনা বিপ্লবের সাধনা। তাহা ব্যর্থ হওয়াতেই রামমোহন গভীর ক্ষোভের সহিত বন্ধুকে লিখিলেন,—"তাহাদের সাধনা আমারও সাধনা, তাহাদের শত্রু আমারও শত্রু।" ঐ চিঠিরই শেষের দিকে রামমোহন লিখিতেছেন: "I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe and the Asiatic nations, specially those that are European colonies"—অর্থাৎ, "বাধ্য হইয়াই আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইতেছে যে, য়ুরোপ এবং এশিয়ার দেশগুলিতে বিশেষ করিয়া যেগুলি য়ুরোপের উপনিবেশ, সেগুলি

তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে, ইহা আমি আর দেখিয়া যাইতে পারিব না।" এই খেদোক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, রামমোহন তাহার জীবিতকালের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিয়া যাইবার আশা গভীরভাবে পোষণ করিতেন। সুতরাং রামমোহন অগ্রে স্বাধীনতার পূজারী, পরে ধর্মসংস্কারক।

আবার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব যখন সফল হইল, তখন রামমোহন সমুদ্রপথে য়ুরোপযাত্রী হইয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনিই সেদিন ফরাসী বিপ্লবকে সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। ফরাসীদেশের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে ইংলণ্ড যাইবার সময় নেটাল বন্দরে তিনি একখানি ফরাসী জাহাজ দেখিতে পাইয়া সেই জাহাজে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাকে সেই ফরাসী জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। ফরাসীরা স্বাধীনতার সেই পূজারীকে আন্তরিকতার সহিত সম্বর্ধনা জানাইল। রাজা ফরাসীর ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে অভিবাদন করিলেন। পর্তুগাল দেশেও যখন নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, রামমোহন অনুরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তুরস্ক ও গ্রীস দেশের মধ্যে প্রবল বিবাদ চলিতেছিল। রামমোহন একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেন যাহাতে গ্রীসরা তুরস্কবাসীদের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়। বিপ্লবী আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কেও রামমোহনের সেই একই সহানুভূতি দেখিতে পাই। নিপীড়িত নিষ্পেষিত বিপ্লবী আয়ার্ল্যাণ্ড বরাবর রামমোহনের অতি প্রিয় ছিল। সেখানকার দুর্ভিক্ষে শুধু চাঁদা দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, তাঁহার জীবনীকার বলেন, সেই চাঁদার আবেদনপত্র পর্যন্ত তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮২২, ১১ই অক্টোবর তারিখের 'মিরাৎ'-এ 'আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপত্তি ও অসন্তোষ'-শীর্ষক একটি তীব্র প্রবন্ধ রামমোহন লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি এখানকার রাজপুরুষদের পছন্দ হয় নাই। বিপ্লবী আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন রামমোহনের 'মিরাৎ' বন্ধ হইবার অন্যতম কারণ

এইভাবেই সেদিন স্বাধীনতার পূজারী ও বিপ্লবের বন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের নাম সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেদিনের পৃথিবীতে

রামমোহনের একক কণ্ঠেই বিপ্লবের অভিনন্দন-বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। মধ্য-আমেরিকায় গুয়াতেমালার চিন্তানেতা ছিলেন দেল্ ভালে। তাঁহারই নেতৃত্বে সেদিন গুয়াতেমালা স্পেনের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমোচনের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিল। জেরেমি বেন্থাম রামমোহনকে এই দেল্ ভালের সমগোত্রীয় মানুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বেন্থাম তখনকার ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। বয়সে তিনি রামমোহন অপেক্ষা চব্বিশ বৎসরের বড়ো ছিলেন। এহেন লোক পর্যন্ত রামমোহনের গুণমুগ্ধ ছিলেন। পত্রযোগেই বেন্থামের সহিত রামমোহনের আলাপ হইয়াছিল। সেই বহুমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন প্রবীণ নেতা জেরেমি বেন্থাম রামমোহনকে এতদূর শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, রাজা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তাঁহাকে তিনি 'মানবতার কার্যে প্রিয় সহকর্মী' বলিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন সংস্কারবাদী। তিনি লিখিলেন: "স্থিরবুদ্ধি লোকমাত্রেই ভারতের পরাধীনতা ও বিদেশী শাসনের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন।" কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, বিদেশী শাসন হইলেও তিনি ইহার স্বপক্ষে ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আরো বেশ কিছুদিন থাকাই মঙ্গল।" ইংরেজশাসনের পক্ষে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেও রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্ধ স্তাবক ছিলেন ভাবিলে ভুল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, ভারতবাসীর মত উপেক্ষা করিয়া ভারতস্থিত ব্রিটিশ শাসকেরা যখনই আইন ও বিধি প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই রামমোহন তাহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাইয়া প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক—রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনার এই দুইটি ধারা মিলাইয়াই তাঁহার বিশ্বমৈত্রী, সৌভ্রাত্র এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর মানুষের মুক্তিসংগ্রামে রামমোহন রায় সেদিন যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সকল পরিচয় আজও উদ্ঘাটিত হয় নাই। স্বাধীনতার বন্ধু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের শত্রু হিসাবে রামমোহনের নাম তাঁহার জীবিতকালেই পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, রামমোহন

ইংরেজ শাসনকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তিনি একদিনের জন্যও বর্জন করেন নাই। তাঁহার চিন্তা ও চরিত্রের এই স্ববিরোধিতার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে, সেই বহু-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে আমরা বুঝিতে পারিব না, কিম্বা তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিরূপণ করিতে পারিব না।

চৌদ্দ

রামমোহন যে সময়ে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কার-আন্দোলনের আবর্তের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পারিবারিক জীবন খুব সুখময় ছিল না। কলিকাতায় বিভিন্ন আন্দোলনের সূচনা করিয়া তিনি যেমন বাংলার হিন্দুসমাজ ও পাদ্রীসমাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার নিজের পরিবারের মধ্যেও তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। তারিণী দেবী স্বয়ং ছিলেন রামমোহনের জীবনে এক দুষ্ট গ্রহস্বরূপ। গোবিন্দপ্রসাদকে সম্মুখে রাখিয়া পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি মামলার পর মামলা আনিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র। বর্তমান আলোচনার পক্ষে রামমোহনের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত এইসব পারিবারিক মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই।*

এই সময়ে রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ (ইনি তখন বর্ধমানের কালেক্টরিতে সেরেস্তাদারের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন) একটি মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়াইয়া পড়েন। অনেকে অনুমান করেন যে, এই মোকদ্দমা রামমোহনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রপ্রসূত। এইসব বৈষয়িক গোলযোগের মধ্যে থাকিয়াও রামমোহন দিনের পর দিন দেশের কাজ করিয়াছেন, দেশের কল্যাণ চিন্তা করিয়াছেন। এইখানেই রামমোহন-চরিত্রের অসাধারণত্ব। রাধাপ্রসাদকে মুক্ত করিবার জন্য রামমোহন খুবই ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজামত আদালত রাধাপ্রসাদকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। শেষ মোকদ্দমায় তারিণী দেবী হারিয়া যান এবং শেষজীবনে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। কিন্তু তখন সংশোধনের সময় ছিল না। অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে তারিণী দেবী দেশ ত্যাগ করিয়া একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় পুরী চলিয়া যান।

* কৌতূহলী পাঠক এ-বিষয়ে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন প্রসঙ্গ' বইখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। এই মূল্যবান বইখানি রামমোহনের পারিবারিক জীবনের বহু ঘটনার উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে। রামমোহন-বিদ্বেষী একদল গবেষকের প্রচার-কৌশলে এবং তথ্য-বিকৃতি ও তথ্য-বিলুপ্তির দ্বারা লোকসমাজে রাজার বৈষয়িক জীবন সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণা ও অপবাদ বদ্ধমূল হইয়াছে, প্রভাতবাবুর গ্রন্থে সেইগুলির অসারতা চূড়ান্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

সেইখানে দুঃসহ মনঃকষ্ট ও অর্থকষ্ট ভোগ করিয়া ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামমোহন ‘সম্বাদ কৌমুদী’তে তাঁহার মায়ের মৃত্যুসংবাদ ছাপাইয়াছিলেন। তারিণী দেবীর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আর একটি দুর্দৈব রামমোহনের জীবনে নামিয়া আসিল। মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতীর মৃত্যু হইল। রমাপ্রসাদের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র।

রামমোহনের জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, “কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাধাপ্রসাদকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন এবং এই কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যদি তোমার মাতার মরণাপন্ন পীড়া দেখ, তবে অতি শীঘ্র আমাকে সংবাদ দিবে; আর যদি তিনি মৃত্যুমুখে পতিতা হন, তবে কোনক্রমে তাঁহার মুখাগ্নি করিও না। অল্পকাল পরেই শ্রীমতীর মৃত্যুসংবাদ আসিল। ইহা বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায় শোকার্ত হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া পরলোকগতা সহধর্মিণীর চিতার উপরে দাম্পত্য প্রণয়ের নিদর্শনস্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন।” মুখাগ্নি করিতে নিষেধ করিবার কারণ, রামমোহন বলিয়াছিলেন, উহা কোনো শাস্ত্রীয় বিধি নহে।

রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ এই শ্রীমতী দেবীরই গর্ভজাত সন্তান ছিলেন।

কলিকাতায় রামমোহনের কর্মজীবনের সাক্ষী ছিলেন জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম্। বাকিংহাম রামমোহনের সমসাময়িক ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সাংবাদিক। তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোহনকে ভালো করিয়া জানিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, “রামমোহন যদি (গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা না করিয়া) কেবল নিরপেক্ষ থাকিতেন, তাহা হইলে পদ ও চাকরির আকারে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রচুর পুরস্কার পাইবার সুযোগ তাঁহার হইত। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির জন্য যেমন, সত্যের জন্যও তেমনি সমান লক্ষ্য ছিল বলিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের উন্নতি সাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম ও শাসন-প্রণালীতে সমভাবে আবশ্যক সংস্কার যথাসম্ভব সত্বর সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম করিয়া আসিতেছেন।

তাহতেে এই পুরস্কার পাইয়াছেন যে সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং খ্রীষ্টীয় ইংলণ্ডীয় গির্জার বড় বড় পাদ্রীদের অমৈত্রী ও ঈর্ষ্যার পাত্র হইয়াছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখানা চালান। নিজের কেতাবপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন। এবং নানাবিধ মানবহিতকর ও দয়াধর্মের কাজ করেন। তাহাতে তাঁহার আয়ের এক তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয়।"

যে পনর বৎসরকাল রামমোহন কলিকাতায় বিবিধ সংস্কার-কার্যে একাগ্র-চিত্তে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রতি বাংলা দেশের রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সীমা ছিল না। কথিত আছে, তাঁহার জীবননাশের জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল; কতবার তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা পর্যন্ত হইয়াছিল। আত্মরক্ষার জন্য রামমোহনকে একজন ইংরেজ দেহরক্ষী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার নাম মিঃ মার্টিন। ইনি মাণিকতলার বাড়িতেই থাকিতেন এবং রাজার জীবনরক্ষার সকল দায়িত্ব তিনি লইয়াছিলেন ও সেইমত ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। মার্টিন রামমোহনের ইংলণ্ডযাত্রায় তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে রামমোহনের চরিতকার লিখিয়াছেন, "মিঃ মার্টিন বারুদ বন্দুক ও ছোরা প্রভৃতি আনাইয়া রাখিলেন। বাটী রক্ষার জন্য বরকন্দাজ সকল নিযুক্ত করিলেন। রামমোহন রায় যখন বাহিরে গমন করিতেন, তিনি গুপ্তভাবে আপনার বক্ষের মধ্যে একটি ছোরা লইতেন। যে প্রকার যষ্টির মধ্যে তরবারি থাকে, সেই প্রকার একটি যষ্টি লইতেন। ইহা ভিন্ন মার্টিন সাহেব তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহারও সঙ্গে একটি পিস্তল ও একটি তরবারিবিশিষ্ট যষ্টি থাকিত। অস্ত্রধারী ভৃত্যগণও সমভিব্যাহারে থাকিত। তাঁহার জীবননাশের জন্য দুইবার তাঁহাকে আক্রমণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন।"

ইহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, রামমোহনের কর্মজীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। মৃত্যু ও বিপদকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়াই লোকশিক্ষক রামমোহন কাজ করিয়া গিয়াছেন। সুখ, বিলাস ও আয়াস-আরামের অজস্র উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, এই রাজর্ষি একটি মহৎ ব্রতের উদ্‌যাপনে নিজেকে

এমনভাবে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অভিমন্যুর ন্যায় রামমোহনের কর্মজীবন সপ্তরথী পরিবেষ্টিত ছিল বলা যাইতে পারে—কিন্তু স্বীয় মহত্বে তাঁহার এমনই অটল বিশ্বাস ছিল, দেশের উজ্জল ভবিষ্যতের উপর এমন অগাধ আস্থা ছিল যে, নিন্দা ও নির্যাতনে পৌরুষ ও নির্ভীকতার সেই বিগ্রহমূর্তি টলে নাই, শাসকের ভ্রূকুটিতে রামমোহন কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই, কোনো প্রলোভন তাঁহাকে আদর্শভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। বীর যোদ্ধার মতই তিনি জীবনের রাজপথে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সত্য ও ন্যায়ের পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিকূলতার ব্যূহ তিনি অবলীলাক্রমে ভেদ করিয়া স্বীয় লক্ষ্যসাধনে অবিচল ছিলেন।

রামমোহনের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু উল্লেখ করি নাই। হেমলতাদেবীর বিবরণ হইতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"রাজা রামমোহন রায়ের বড় ছেলে রাধাপ্রসাদের দুই কন্যা। তাঁর পুত্র-সন্তান ছিল না। বড় মেয়ে চন্দ্রজ্যোতি, ছোট মেয়ে মৈত্রেয়ী। নাম দু'টি রাজারই রাখা। রাজার বড় পৌত্রী চন্দ্রজ্যোতির দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিবাহ দেন মুর্শিদাবাদ-নিবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সম্প্রদান করান রাজা পুত্রবধূ যজ্ঞেশ্বরীদেবীকে দিয়ে, চন্দ্রজ্যোতির বাবা রাধাপ্রসাদকে দিয়ে না করিয়ে। বিবাহ হলো যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠানে। সম্প্রদানের সময়ে রাজা নিজে দাঁড়িয়েছিলেন বাইরে। সমাজচ্যুতির ভয়ে রাজার পৌত্রীকে সে সময়ে অনেকেই বিবাহ করতে নারাজ হন, যদিও চন্দ্রজ্যোতি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। ··কি বলিষ্ঠ দেহখানি ছিল তাঁর। ভোরে উঠে দু'হাতে দুটো ভীমের গদার মত মুগুর নিয়ে ভাঁজতেন তিনি খেলার মত হেলায়। বিশ-বাইশটা জলভরা সারি সারি সাজান কলসী থেকে স্নানের সময় রাজা মাথায় জল ঢালতেন চৌকিতে বসে স্বয়ং একটির পর একটি, একবার ডান হাতে একবার বাঁ হাতে নিয়ে। দুপুরে খেতে আসতেন অন্দর মহলে প্রতিদিন।···বাহির মহলে সারা দুপুর কাজ করে

বৈকালে পায়ে হেঁটে তিনি বেড়াতে বেরুতেন। যাওয়ার আগে অন্দরে এসে খানিকক্ষণ ব'সে যেতেন নিয়মিত; তারও ব্যতিক্রম ঘটত না কখনো। চেয়ার পড়তো তিনখানি—দুইখানি দুই স্ত্রীর, একখানি নিজের। স্ত্রীদের আগে না বসিয়ে রাজা নিজে বসতেন না কখনো। চন্দ্রজ্যোতির বিবাহের পরেই রাজা বিলাত যাত্রা করেন। ছোট পৌত্রী মৈত্রেয়ী দেবী তখন নিতান্ত শিশু। যাবার আগে শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রীজপ। ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু-প্রথা। তাঁর ছোট পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের পত্নী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণ-তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকগুলি আওড়াতে আমরা শুনেছি। যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে; ধর্মসংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম। রাজার ছোট স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন নিঃসন্তান। রমাপ্রসাদের জন্মসময় থেকেই বিমাতা উমাদেবী তাঁকে পালনের ভার নেন, একান্ত অনুরোধের ফলে ও স্বেচ্ছায়। উমাদেবী জীবিত ছিলেন রাজার বিলাত যাত্রাকালে। যাওয়ার খবর কিন্তু রাজা তাঁকে জানিয়ে যান নাই। রাজা জাহাজে রওনা হয়ে যাবার পরে সে খবর তিনি পান। রাজা আর ফিরতে পারলেন না; ওঁর সঙ্গে আর দেখা হলো না, এই শোকটা উমাদেবী জীবনে কখনো ভোলেন নাই।"

বহুদিন হইতেই রামমোহনের ইচ্ছা য়ুরোপ যাইবেন, ইংলণ্ড যাইবেন। হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা তখনো কলিবর্জ্য। রামমোহন সেই কুসংস্কার বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার ইংলণ্ড যাইবার প্রয়োজন ছিল। গুরুতর প্রয়োজন। ব্যক্তিগত নয়—দেশের জন্য, জাতির স্বার্থের জন্য প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখিয়াছি, রাজার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল ইংলণ্ড—ইংলণ্ডের মহাসভা। এখানে যখনই বাধা পাইয়াছেন, প্রতিকারের জন্য ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে দাবী করিয়াছেন। কখনো কোন দাবী গ্রাহ্য হইয়াছে, কখনো হয় নাই। য়ুরোপে যাইতে পারিলে দেশের জন্য আরো বহুবিধ রাষ্ট্রীয়

অধিকার তিনি অর্জন করিতে পারিবেন—এই বিশ্বাসই তাঁহাকে য়ুরোপ-ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

রামমোহন তাঁহার আত্মকথার শেষভাগে লিখিয়াছেন :

"এই সময়ে য়ুরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা হইল।...ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দের বিচার দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজ্যশাসন ও ভারতবাসিগণের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বহু বৎসরের জন্য স্থিরীকৃত হইবে, ও সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভিকৌন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।" এ ছাড়া, দিল্লীর বাদশাহের দৌত্যের কথাও রামমোহন উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড যাত্রার চারিটি কারণ ছিল : (১) য়ুরোপের আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ; (২) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ এবং নূতন শাসন-সংস্কার ; (৩) সতীদাহ-নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে ধর্মসভার আপীল ও (৪) পার্লিয়ামেণ্টে দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের আবেদনের তদারক। এই চারিটির মধ্যে প্রধান কারণ অবশ্য কোম্পানীর সনন্দ।

রামমোহনের নাম তখন ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে সুপরিচিত। ভারতের রাজপ্রতিনিধি অবশ্য তাঁহার ইংলণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে উদ্যোগী ছিলেন না বা উৎসাহও প্রকাশ করেন নাই। রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকল খবর রাখিতেন। নূতন সনন্দ ও সেই সঙ্গে শাসন-সংস্কার বিবেচনার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে যে সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাহার নিকট সাক্ষ্য দিতে রামমোহন আহুত হইয়াছিলেন। সেদিন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রামমোহনের অভিমতের মূল্য ছিল বলিয়াই সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য রাম-মোহনের ডাক আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি কমিটিতে প্রথমে উপস্থিত হন নাই। তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া বোর্ড অব কণ্ট্রোলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার জন্য রামমোহনকে এই সময়ে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ইহাই রামমোহনের বিখ্যাত রাজনৈতিক রচনা : *Expositon of the*

Practical Operation of the Judicial and Revenue systems of India এবং ইহাতে তিনি ভারতবর্ষের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে যে গভীর আলোচনা করেন তাহা তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

রামমোহনের এই মূল্যবান আলোচনাটির প্রধান বক্তব্য এই ছিল: (১) প্রজার কর লাঘব করিতে হইবে; (২) জমিদারদের দেয় রাজস্ব কমাইতে হইবে; (৩) ইহাতে আয়ের যে ঘাটতি হইবে তাহা প্রমোদ-কর ধার্য করিয়া এবং উচ্চ বেতনের ইংরেজের পরিবর্তে অল্প বেতনে দেশীয় লোকদিগকে কালেক্টর নিযুক্ত করিয়া পূরণ করিতে হইবে; (৪) ভূমিতে প্রজাকে চিরস্থায়ী স্বত্ব দান করিতে হইবে এবং (৫) ব্যয়বহুল স্থায়ী সৈন্যদল না রাখিয়া প্রজাদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাদি রামমোহনের প্রিয় কবি ছিলেন। শেষোক্ত বিষয়টির যুক্তিস্বরূপ রামমোহন সাদির এই কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন: "প্রজাবৃন্দের সহিত বন্ধুভাবে বাস কর, শত্রুদল হইতে যুদ্ধের কোনো ভয় থাকিবে না। ন্যায়বান রাজার পক্ষে প্রজাগণই তাঁহার সৈন্য।"

ইহা ভিন্ন, আরো অনেক বিষয়ের আলোচনা এই বক্তব্যলিপিতে ছিল; যথা—এদেশ হইতে বহু অর্থ বিলাতে চলিয়া যায়, কি উপায়ে তাহার অংশ এদেশে রক্ষিত হইতে পারে, কি উপায়ে শাসনব্যয় সংক্ষেপ করা যায় ইত্যাদি। দেশের অর্থনীতির দিকটাও তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

মিস কলেট সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত রামমোহনের এই মূল্যবান্ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য সম্পর্কে এই মন্তব্য করিয়াছেন: "আমরা আগাগোড়াই দেখিতে পাই নূতন ভারতের প্রতিনিধি রামমোহন শুধু ধনী ও শিক্ষিতদেরই বন্ধু নহেন, দরিদ্র ও প্রপীড়িত প্রজাগণেরও বন্ধু এবং নেতা।"

ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে রামমোহনের জীবনের একটি ঘটনা বড় সুন্দর। সেই কথাটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "ইংলণ্ড গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন।

আমাদের বাড়ির সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্রিত হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা সস্নেহে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।"

বলা বাহুল্য, রামমোহন তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পদ—নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের উত্তরাধিকারত্ব সেদিন বালক দেবেন্দ্রনাথকেই দিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবত তাহাকেই তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্য মনে করিয়া থাকিবেন।

১৮৩০, ১৫ নভেম্বর।

'আলবিয়ন' জাহাজে চড়িয়া রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। পাশপোর্টে লেখা হইল 'রাজা' রামমোহন রায়। দিল্লীর বাদশাহের প্রদত্ত এই উপাধি রামমোহন সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশপোর্টে আরো উল্লিখিত ছিল যে, মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজদূত রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের জীবনে এই ঘটনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। জীবনের সায়াহ্নকাল অবধি তিনি স্বদেশে স্বজন ও স্বজাতির হস্তে পাইয়াছেন শুধু লাঞ্ছনা, নির্যাতন আর অপমান। বিদেশী শাসকের ভারতস্থ প্রতিনিধিগণও তাঁহাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। এমন কি, ইংলণ্ড যাত্রাকালে রামমোহনকে কলিকাতায় কোনো প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত পর্যন্ত করা হয় নাই। নীলকণ্ঠের মতন আজীবন রামমোহন শুধু নিন্দার বিষই পান করিয়াছেন। তাই বুঝি তাঁহার জীবনবিধাতা জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত, ভূতপূর্ব মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করিলেন, দৌত্যকার্য দিয়া আরো সম্মানিত করিলেন।

আর য়ুরোপের জ্ঞানী ও গুণী সমাজ, এমন কি ফরাসী সম্রাট পর্যন্ত রামমোহনকে কতভাবে সম্মান দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতের ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিগণ মুঘল সম্রাটের প্রদত্ত এই উপাধি ও দৌত্য স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের মহাসভা উহা স্বীকার করিয়াছিল।

রামমোহনের আগে আগে চলিয়াছে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত খ্যাতি। ইংলণ্ড যাইবার বহু বৎসর পূর্বেই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন, ধর্ম ও সমাজসংস্কারক বলিয়া রামমোহনের খ্যাতি য়ুরোপ ও আমেরিকাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন কে জানিত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার এই প্রবাস গমন তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি হইতে মহাযাত্রায় পরিণত হইবে? রাজার সঙ্গে চলিল পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায়, দুইজন ভৃত্য—রামহরি দাস ও সেখ বক্সু এবং দ্বাদশবর্ষীয় পালিত পুত্র রাজারাম রায়। আর ছিলেন মার্টিন সাহেব এবং স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট। আর্ণট রাজার একান্ত সচিবের কাজ করিতেন। তাঁহার বন্ধু, হুগলি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ সাদারল্যাণ্ড সেই একই জাহাজে রাজার সহযাত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পথ রামমোহনের চিন্তা আচ্ছন্ন করিয়াছিল শুধু একটি বিষয়—রিফর্ম বিল, অর্থাৎ শাসন-সংস্কার।

রামমোহন সরকারী কার্য হইতে যে বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করেন, তাহার দুই বৎসর পূর্বে এক 'সনন্দ আইন' দ্বারা বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতে কোম্পানীর মেয়াদ বিশ বৎসর বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই মেয়াদ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হইবার কথা এবং তখন আবার চতুর্থবারের জন্য কোম্পানীর বিশ বৎসরের জন্য নূতন সনন্দ লাভ করিবার কথা। রামমোহন ইহা অবগত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বেই 'রিফর্ম বিল' সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। কমিটির সুপারিশ যথাসময়ে পার্লিয়ামেণ্টে আলোচিত হইল। রামমোহনকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উক্ত কমিটি আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, দেশের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায় করিয়া লইবার ইহাই সুযোগ। এই কারণেই তিনি ইংলণ্ড যাত্রার জন্য এমন ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

রাজার সহযাত্রী মিঃ সাদারল্যাণ্ডের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি

যে, "জাহাজ যতই ইংলণ্ডের নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই রামমোহনের চিত্ত পার্লিয়ামেণ্টে তখন কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। পথিমধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল, ইংলণ্ডে মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হইয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কেবলমাত্র বাহাদুর শাহের দৌত্য লইয়াই রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন নাই—সমগ্র ভারতের কথাই তাঁহার চিন্তাকে তখন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই নূতন শাসনসংস্কার মারফৎ যতটা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লাভ করা যায়, রামমোহন তাহারই জন্ম সেদিন ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড তথা য়ুরোপে সেদিন তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম যোগ্য প্রতিনিধি। যোগ্যতম দাবীদার।

পথিমধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রের মধ্যপথে একখানি ফরাসী জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল। জাহাজ থামাইয়া সেই ফরাসী জাহাজে গিয়া ফরাসী-বিপ্লব-ভক্ত ও ভল্‌তেয়ার-ভক্ত রামমোহন ফ্রান্সের বিপ্লবী ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলেন। কথিত আছে, এই শ্রদ্ধা নিবেদনের উৎসাহের আবেগে জাহাজের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি অবশিষ্ট জীবন একপ্রকার খঞ্জ হইয়াছিলেন। রামমোহনের জীবনে বহু ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটির ব্যঞ্জনা সামান্ম নহে।

॥ পনর ॥

প্রায় পাঁচ মাস পরে রামমোহন ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এখন হইতে রাজার জীবনে আরেক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এতকাল তিনি ভারতবাসীর নিকট ইংরেজের কথা বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইংরেজের কাছে ভারতবর্ষের কথা, ভারতবাসীর কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। হিন্দুজাতির মধ্যে তিনিই মহান্ প্রতিনিধি যিনি সাম্রাজ্যের রাজধানীতে আসিয়া ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিলেন।

য়ুরোপে নানাবিধ কর্মের ভিতর দিয়া রামমোহন প্রায় আড়াই বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই আড়াই বৎসরকালের ইতিহাস অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও আজো পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। রামমোহনের মৃত্যুর ষাট বৎসর পরে তাঁহার ভাব-সাধনার অন্যতম উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং তিনিও সেখানে দীর্ঘকাল ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়া কি করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহার মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরে জনৈক মার্কিন মহিলা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহনের য়ুরোপ গমন ও সেখানে তাঁহার দীর্ঘকাল অবস্থান—ইহার বিবরণও আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার জন্যও আমরা দুইজন বিদেশিনী মহিলার নিকট কৃতজ্ঞ—সোফিয়া ডবসন কলেট এবং কুমারী মেরি কার্পেণ্টার। কিন্তু আমরা, রামমোহনের স্বদেশীয়রা, তাঁহার জন্য কি করিলাম? এই প্রশ্ন অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তুলিয়াছিলেন। সেই প্রশ্ন আজো রহিয়া গিয়াছে। বাঙালির রামমোহন-অনুশীলন আজো অসম্পূর্ণ।

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণে রামমোহন এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। পুরাতন ইংলণ্ডের উপর তখন সবেমাত্র নবীন ইংলণ্ড ধীরে ধীরে রূপ-রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই নবীন ইংলণ্ডে নবভারতের প্রতিনিধি রামমোহন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রথম জীবনীকার কলেটের একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।* তিনি রাজার জীবনচরিতের 'ইংলণ্ডে দৌত্য' শীর্ষক অধ্যায়ের একস্থানে লিখিয়াছেন: "He came at a time

of crucial transition in the political history of the United kingdom,…while he was here, he saw the East India Company changed by statute from a trading concern into a political organisation...He was here, in a word, when the New England was being born out of the heart of Old England. In him the New England first became acquainted with the New India."

আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসেও রামমোহনের ইংলণ্ড পরিদর্শন একটি বিশেষ দিক্‌চিহ্ন। প্রাচ্য জগতে, বিশেষ করিয়া ভারতভূখণ্ডে পাশ্চাত্য জাতির অভ্যুদয় অনেক কাল যাবৎ ঘটিয়াছে কিন্তু প্রাচ্যের অভ্যুদয় য়ুরোপে বা ইংলণ্ডে তখনো পর্যন্ত হয় নাই। রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমগ্র ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্য যেন মিলনের স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়িল। সমগ্র বিষয়টির ইহাই ছিল নিগূঢ় তাৎপর্য, অথবা মিস কলেটের ভাষায়— 'the world-historic import.' এবং ইহা ব্যতিরেকে সেই মহাজীবনের ঐক্যবোধ সম্পূর্ণ হইত না।

১৮৩১, ৮ই এপ্রিল।

লিভারপুল বন্দরে জাহাজ আসিল।

রামমোহন বন্দরে নামিলেন। বন্দর হইতে নগরে আসিয়া একটি হোটেলে উঠিলেন। রাজার ইংরেজ-চরিতকার লিখিয়াছেন: "লিভারপুলে বড় বড় লোকের বৈঠকখানায় ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে এই হিন্দুকে দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ সরল বিশ্বাসে আগ্রহ ও তেজের সহিত 'রিফর্ম বিল' সমর্থন করিতেছেন, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতার গুণ বর্ণনা করিতেছেন দেখিয়া আমাদের দেশবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ধর্মবিষয়ে আলাপের সময়ে তিনি যখন অবলীলাক্রমে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবচন ক্রমাগত উদ্ধৃত করিতেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া হয়তো তাঁহারা অবাক হইতেন।"

এইখানেই সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক উইলিয়াম রস্কোর সহিত রামমোহনের সাক্ষাৎ হইল। ভারতবর্ষে থাকিতেই পত্রযোগে ইঁহার সহিত রাজার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রস্কো রামমোহনের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। রামমোহনের সহিত বৃদ্ধ রস্কোর সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যেন হাত মিলাইল। সে দৃশ্য অপূর্ব! প্রাচ্য প্রথায় উষ্ণীষ-পরিহিত মস্তকে রামমোহন রস্কোকে নমস্কার করিয়া বলিলেন: "যে মহাপুরুষের খ্যাতি শুধু য়ুরোপ কেন, পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আজ আমি কত সুখী ও ধন্য হইলাম।" রস্কোর বয়স তখন আটাত্তর, বাতে তিনি উত্থানশক্তি-রহিত। রস্কো বলিলেন—"ভগবানকে শত ধন্যবাদ, এই শুভদিন দেখিতে তিনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।"

রাজা অল্পদিন মাত্র লিভারপুলে ছিলেন।

এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি লণ্ডন যাত্রা করিলেন। পথে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরের কল-কারখানা দেখিতে গিয়াছিলেন। মিঃ সাদারল্যাণ্ড লিখিতেছেন: "ম্যাঞ্চেষ্টারে পুরুষ, নারী ও বালক শ্রমজীবিগণ সকলে কাজ ফেলিয়া দলে দলে 'ভারতীয় রাজা' দেখিতে ছুটিল। অনেকে তাহাদের মলিন কয়লা মাখান হাত লইয়া তাঁহার সহিত করমর্দন করিতে ব্যগ্র হইল। মেয়েরা তাহাদের অবিন্যস্ত বেশ লইয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে তাঁহার দিকে ছুটিল। বাহিরের জনস্রোত প্রতিরোধ করিতে পুলিশের সাহায্য লইতে হইল। রাজা তাহাদের অনেকের সঙ্গে করমর্দন করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তিনি আশা করেন তাহারা সকলে 'রিফর্ম বিল' সম্বন্ধে মন্ত্রী-দলের পক্ষ সমর্থন করিবেন।"

লণ্ডনে আসিয়া রামমোহন প্রথমে একটি হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে তিনি রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের একখানি বাড়ি ভাড়া করিয়া কয়েক মাস সেখানে বাস করেন। সেই সময়ে লণ্ডনে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে রাজা রামমোহনের বাড়ি ভারতবাসীর দূত-গৃহ বা দরবার গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি তো কেবলমাত্র মুঘল সম্রাটের দৌত্য লইয়া ইংলণ্ডে যান নাই, তিনি যে সমগ্র ভারতের প্রথম সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দূত হইয়া আসিয়াছেন। কোম্পানী

তাঁহার এই দৌত্য স্বীকার না করিলেও ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট রামমোহনকে সেই মর্যাদাই দিয়াছিলেন।

লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিবার প্রথম রাত্রেই জেরেমি বেন্থাম রামমোহনের সহিত হোটেলে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রাজা তখন শয্যায় আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু রামমোহনকে দেখিবার জন্য এই মনীষী এমনই ব্যগ্র ছিলেন যে, সেই নিশীথ রাত্রেই তিনি হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ না হওয়াতে তিনি একখানি কার্ডে লিখিয়া আসিলেন: "জেরেমি বেন্থাম, তাঁহার বন্ধু রামমোহন রায়ের নিকট।"

একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানগণ রামমোহনকে লণ্ডনে প্রকাশ্য অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সভাতে রামমোহন যেরূপ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে অতি কম লোকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে ইহা ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ভারত তখন ইংরেজ-শাসিত দেশ। ভারতের প্রতি পাশ্চাত্য সভ্য জাতিসমূহের শ্রদ্ধা বিরল। পরাধীন ভারতের একটি মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী, সভ্যতা ও সম্পদের কেন্দ্রস্থল লণ্ডনে এক প্রকাশ্য সভায় শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিতেছেন—এমন দৃশ্য কল্পনার অতীত। লণ্ডনের সমকালীন পত্রিকা 'মন্থলি রিপজিটারি,' 'ওয়েষ্ট মিনিস্টার রিভিয়ু' প্রভৃতি পত্রিকায় এই সম্বর্ধনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কার্কল্যাণ্ড, রেভারেণ্ড ফক্স প্রভৃতি সুধীজন রামমোহনের প্রশংসা করিয়া সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

রামমোহনের খ্যাতি তাঁহার পুরোগামী ছিল. এখন তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। আগেই বলিয়াছি, ভারত গভর্ণমেণ্ট দিল্লীর বাদশাহ প্রদত্ত রামমোহনের 'রাজা' উপাধি ও দৌত্যকার্যে নিয়োগ অনুমোদন করেন নাই। বলা বাহুল্য, ভারতে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অনেকেই রামমোহনকে খুব বেশি প্রাধান্য দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে আসিয়া রামমোহন যখন সর্বত্র অভিনন্দিত ও সমাদৃত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অনেকেরই ভুল ভাঙিল। ইংলণ্ডের রাজার মন্ত্রীগণ রামমোহনের 'রাজা' উপাধি ও মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব দুই-ই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

তখন চাকা ঘুরিয়া গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ রামমোহনকে এক প্রকাশ্য ভোজসভায় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই ভোজ-সভার তারিখ ১৮৩১, ৬ই জুলাই। আগষ্ট মাসের 'এসিয়াটিক জার্ণাল' পত্রিকায় এই সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই স্মরণীয় ভোজ-সভায় অভিনন্দনের উত্তরে রামমোহন বলিয়াছিলেন : "যেদিন অন্যান্য হিন্দুরা বিলাতে আসিবেন, আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছি।" অবশেষে বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি চার্লস গ্র্যাণ্ট রামমোহনকে বাকিংহাম প্রাসাদে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজ রাজদরবারে রামমোহনই প্রথম ভারতবাসী যিনি অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ও বিদেশীয় দূতদের সহিত রামমোহন এক-আসনে বসিয়াছিলেন। লণ্ডনের প্রসিদ্ধ বিদ্বদ্‌সমাজ 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' তাঁহাদের বাৎসরিক সভায় রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই সভায় কোলব্রুক সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব রামমোহন উপস্থিত করেন।

রিজেণ্ট স্ট্রীটের বাড়িতে রামমোহন বেশি দিন বাস করেন নাই। এখানে যেভাবে তিনি থাকিতেন তাহাতে অনেক খরচ হইত। আর এতখানি জাঁক-জমকের মধ্যে থাকা তিনি পছন্দও করিতেন না। "তিনি তখন ঐ প্রাসাদতুল্য বাটি ত্যাগ করিয়া, বেডফোর্ড স্কোয়ারে কলিকাতার হেয়ার সাহেবের সহোদর-ভাইদের বাটিতে গিয়া বাস কবিতে লাগিলেন। যতদিন লণ্ডনে ছিলেন, ঐ স্থানেই থাকিতেন। একখানি ঘোড়ার গাড়ি রাখিয়াছিলেন। একজন কোচম্যান ও একজন সহিস রাখিয়াছিলেন; তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক দিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ন্যায় থাকিলেও, লণ্ডনের প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহার সংসর্গপ্রার্থী হইতেন।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কলিকাতা হইতে ডেভিড হেয়ার তাঁহার ভাইদের বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যেন তাঁহারা রামমোহনের সকল রকম তত্ত্বাবধান করেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহার সুবিধা করিয়া দেন।

রাজার জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে, লণ্ডনে থাকিবার সময়ে রামমোহন সেখানকার নাট্যশালায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কোনো

কোনো অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার আলাপও হইয়াছিল। এ-বিষয়ে রাজার মনে কোনো কুসংস্কার ছিল না। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই-ই হাস্যালাপে মুগ্ধ হইয়া যাইত। একদিন 'ইসাবেলা' নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া রামমোহন তো কাঁদিয়াই আকুল। অভিনয় এত সুন্দর হইয়াছিল যে, সে করুণ দৃশ্য রামমোহনের কোমল প্রাণের তারে আঘাত দিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নাচ দেখিতেও তিনি যাইতেন। ইহাও সেই বিরাট চরিত্রের আর একটি দিক।

লণ্ডনে থাকিবার সময়ে একদিকে রামমোহন নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ ও কল্যাণের চেষ্টায় গ্রন্থ প্রকাশ ও অন্যান্য কার্যে সর্বদাই অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। মোট কথা, ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে রাজা রীতিমত স্পন্দনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার সকল চিন্তার কেন্দ্রে ছিল 'রিফর্ম বিল'। পার্লিয়ামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ১৮৩০-এর সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহা লণ্ডনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রকাশক ছিলেন স্মিথ, এল্ডার য্যাণ্ড কোম্পানী। বইখানির নাম : *Exposition of the Practical operation of the Judicial and Revenue systems of India*; ইহার পর লণ্ডনে প্রকাশিত তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম : *Translation of several Principal books, passages and texts of the Vedas, and of some controversial works on Brahmanical theology*. এই বইখানির প্রকাশক ছিলেন পারবারি, এ্যালেন য্যাণ্ড কোম্পানী। ইহার কিছুকাল পরেই ১৮৩২-এর ১৪ই জুলাই তিনি *Remarks on Settlement in India by Europeans* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

প্রথম গ্রন্থে রামমোহন প্রধানত নিম্নলিখিত সংস্কারগুলির প্রস্তাব করিয়াছিলেন : (১) আইন-আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা প্রচলন; (২) সিভিল কোর্টে দেশীয় এ্যাসেসর নিয়োগ; (৩) দেশীয় পঞ্চায়েতি প্রথার মত জুরির বিচার প্রবর্তন; (৪) জজ ও রেভিনিউ কমিশনারদের

পদ পৃথক করা ; (৫) জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পৃথক করা ; (৬) আইন করার পূর্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের মত গ্রহণ এবং (৭) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলি সংহিতাবদ্ধ করা। সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময়ে প্রমাণ-প্রয়োগসহ রামমোহন ভারতে কোম্পানী-শাসনের যে নিপুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা পার্লিয়ামেন্টের অনেক সভ্যের মনে ভারতে কোম্পানীর শাসন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল। রাজা বলিয়াছিলেন, প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবার ব্রিটিশ-শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভারতবাসী-দিগকে নিয়োগ করিলে ক্রমে দেশবাসিগণ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত হইবে।

ইহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সেই সময়ে ইংলণ্ডের মহাসভায় ভারতের দাবী গ্রাহ্য করাইতে রামমোহন কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত তৃতীয় বইখানিই লণ্ডনে রামমোহনের শেষ প্রকাশিত গ্রন্থ এবং লেখক হিসেবে ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। এই বইখানি সম্পর্কে মিস কলেট লিখিয়াছেন: "তাঁহার এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টির ভিতর কি বিরাট আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। ভারতবাসীর পক্ষে এই দলিলখানি তাঁহার চরমপত্র বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।" এই পুস্তকে রামমোহন তাঁহার স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই পাঁচটি কথা বলিয়া গিয়াছেন : (১) ভারত—যেখানে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইবে ; (২) ভারত—যেখানে এক উদার ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিবে ; (৩) ভারত—যাহার সামাজিক অবস্থা পাশ্চাত্য ধরণের হইবে ; (৪) ভারত—যাহা সম্ভবত স্বাধীন হইবে, এবং (৫) ভারত—যাহা এশিয়ার শিক্ষাগুরু হইবে। এমন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রামমোহনই করিতে পারিতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার জন্য যে মানুষ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, তাঁহার পক্ষে স্বাধীন ভারতের আশা করা অতি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কেবলমাত্র তাহাই নহে, আমাদের স্বাধীনতালাভের একশত পনর বৎসর পূর্বে লণ্ডনে বসিয়া রামমোহন লিখিতেছেন—ভারত স্বাধীন হইবে।

এই দূরদৃষ্টি, এই সাহস একমাত্র রাজা রামমোহনের ন্যায় যুগসারথির পক্ষেই সম্ভব।

রামমোহন ইংলণ্ড গিয়াছিলেন প্রকৃতপক্ষে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া।

'হাউস অব কমনস্'-কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির উপর কোম্পানীর সনদের renewal বিবেচনা করিবার দায়িত্ব যখন অর্পিত হয় তখন এই সিলেক্ট কমিটির কাছেই রামমোহন যে দলিলটি দাখিল করিয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব অসাধারণ। এই গুরুত্ব প্রধানত দ্বিবিধ। প্রথমত এই সংক্ষিপ্ত, বিশ্বাসযোগ্য ও রীতিমত প্রশংসার্হ দলিলটি রচনা করিয়াছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ; ফলে ইহাব প্রতিটি বাক্য গভীর প্রত্যয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসনীয় উদারতার সাক্ষ্য বহন করে। দ্বিতীয়ত, এই দলিলটি হইতে রামমোহনের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, যাহার প্রতি অনেক ঐতিহাসিকও সুবিচার করেন নাই।

এই দলিলটিতে আছে: (ক) ভারতের রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে ৫৪টি প্রশ্নের রামমোহন প্রদত্ত উত্তর। (খ) একই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব তথ্যাবলী। (গ) ভারতের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁহার ৭৮টি প্রশ্নের উত্তর, এবং (ঘ) ভারতের অবস্থা সম্পর্কে ১৩টি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর। এই ঐতিহাসিক দলিল হইতে নির্বাচিত কিছু অংশ এখানে দেওয়া হইল।*

ভারতের রাজস্ব-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ১—আপনি যে প্রদেশগুলির সাথে পরিচিত সেখানে জমি কী ভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকে?

উত্তর—বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষে (মেদিনীপুর) জমির মালিক একশ্রেণীর লোক, এঁদের বলা হয় জমিদার! এঁরা এঁদের স্ব স্ব জমির জন্য নির্দিষ্ট খাজনা সরকারকে দেবার সর্তে পুরুষানুক্রমে জমির দখল ভোগ করে থাকেন। একেই বলা হয় জমিদারী প্রথা। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির অধিকারভুক্ত পরিত্যক্ত বা বিজিত প্রদেশগুলিতে জমিদারদের সাথে এখন পর্যন্ত করধার্য সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট চুক্তি করা হয় নি; ফলে ঐ সম্পত্তির কর্তৃত্ব তাদের হাতে নয়, সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এবং

* অনুবাদ: সুশোভন সরকার; অনুবাদকের কৃতিত্বে মূলের গুণ ও স্বাদ দুই-ই অনুভব করা যায়।

সে সব স্থানে সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে নতুন ভাবে কর ধার্য করা হয়ে থাকে।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির খাজনার বেশীর ভাগ সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে (এদেব রায়ত বলা হয়) সরকারী রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা আদায় ক'রে থাকেন। এখানে বিভিন্ন অবস্থানের বিভিন্ন প্রকার জমির উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে খাজনা ধার্য করা হয়ে থাকে। এই সব কৃষকগণ যতদিন ধার্যমত খাজনা দিতে পারেন, ততদিনই জমি তাঁদের অধিকারে থাকে।

প্রশ্ন ৫—জমির মালিকরা কি নিজেই চাষ-আবাদ করেন, না চাষীদের দিয়ে করিয়ে থাকেন।

উত্তর—আমার যতদূর জানা আছে তাতে ক'রে সুবে বাঙলায় জমির মালিকরা ছোট বা বড় খামার ক'রে চাষীদের ইজারা দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন ৭—সাধারণভাবে যে খাজনা ধার্য করা হয় তা কি প্রজাদের দিতে খুব অসুবিধা হয়ে থাকে?

উত্তর—নীতিগতভাবে চাষীকে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ জমির মালিককে খাজনা হিসেবে দিতে হয়। এর এগারোর দশভাগ বা দশের নয় ভাগ সরকারী খাজনা হিসেবে গণ্য হয় আর ১/১০ বা ১/১১ হচ্ছে জমিদারের প্রাপ্য নীট খাজনা। যেহেতু চাষীকে বীজ ও চাষের সমস্ত ব্যয় বহন করতে হয় সেহেতু উৎপন্নদ্রব্যের অর্ধাংশ খাজনা হিসেবে দাবি করা খুবই বেশী বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারগণ, তাঁদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা নিয়ে, খাজনা বৃদ্ধির সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্ন ৯—এখন কি প্রজাদের খাজনা যখন তখন বাড়ান হয়ে থাকে?

উত্তর—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ায় (১৭৯৩) সরকার জমির উপর জমিদারের নিব্র্যূঢ় স্বত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রজার (রায়তের) তেমন কোন অধিকার স্বীকার করা হয় নি। [চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের (১৭৯৩) ১নং এবং ৮নং আইন দ্রষ্টব্য]

১৭৯৩ সালের ৮নং আইনের ৬০নং ধারার ২য় উপধারায় সরকার ঘোষণা করেন যে 'খুদ-কস্ত রায়তে'র (যে চাষী তার নিজের গ্রামে জমি চাষ করে

থাকে) খাজনা-নির্ধারক 'পাট্টা' (ছোট দলিল) কেউ বাতিল করতে পারবে না, 'যদি না প্রমাণ পাওয়া যায় যে তা যোগসাজসে যোগাড় করা হয়েছে' বা 'যে খাজনা চাষী গত তিন বছর দিয়েছে তা পরগণার 'নিরিখ বন্দে'র (সাধারণ হার) থেকে কম' বা 'চাষী যোগসাজসে খাজনা কমিয়ে নিয়েছে' অথবা 'খাজনা ধার্য সংশোধন বা সমান করার উদ্দেশ্যে সমগ্র পরগণা জরীপ করা হলে'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় উপরে লিখিত চারটি সর্তের একটি না হয় আরেকটির বলে জমিদার তার প্রভাব ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা প্রজাদের, এমন কি 'খুদ-কস্ত' রায়তদের পর্যন্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে খাজনা বৃদ্ধি করে থাকে।

প্রঃ ১৩—খাজনা কিভাবে দেওয়া হয়—টাকায়, উৎপন্ন দ্রব্যে না শ্রমে?

উত্তর—খাজনা সাধারণত টাকাতেই দেওয়া হয়। কিন্তু কখনও কখনও অদ্ভুত অবস্থায় মোট উৎপন্নের অর্ধাংশ খাজনা হিসাবে দেবার চুক্তি করা হয়ে থাকে। কখন কখন শ্রম দ্বারাও খাজনা দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু কিছু গ্রামবাসী জমিদারের কাছে চাকরীর সর্তে জমি ভোগদখল করে থাকে।

প্রঃ ১৯—প্রজাদের খাজনা বাকি পড়লে মালিক তা আদায়ের জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন?

উত্তর—তাঁরা দু-একটি ক্ষেত্র বাদে পুলিসের সাহায্যে প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে থাকেন এবং তারপর বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মারফৎ সেগুলি বিক্রী করেন।

প্রঃ ২৯—মালিক কি খাজনার দায়ে প্রজার স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে আটক করতে পারেন?

উত্তর—প্রথমত, পুলিসের কাছে সরাসরি দরখাস্ত করে, দু'একটা ক্ষেত্র বাদে পুলিস কর্মচারীদের সহায়তায় প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মামলা ক'রেও খাজনা আদায়ের জন্য প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা যেতে পারে এবং গ্রেপ্তারও করা চলতে পারে।

প্রঃ ৩০—বাংলা দেশের বর্তমান জমিদারী প্রথা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রায়তওয়ারী প্রথায় চাষীদের অবস্থা কেমন বলে আপনার ধারণা?

উত্তর—দুই ধরনের প্রথাতেই চাষীদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। একদিকে জমিদারদের লোভ ও উচ্চাশা, আর একদিকে আমীন ও অন্যান্য সরকারী

রাজস্ব-কর্মচারীদের শোষণ ও ষড়যন্ত্রের শিকার তারা। তাহলেও বাংলার চাষীদের কথা ভেবে সত্যিই আমার গভীর দুঃখ হয়। এদের জমিদাররা খাজনা-ধার্যের ব্যাপারে সরকারের প্রশ্রয় পায়, কিন্তু এ সরকারী প্রশ্রয়ের এক কণাও এই গরীব চাষীদের ভাগ্যে জোটে নি। যেবার ফলন ভাল হয়, দাম যায় পড়ে আর চাষীকে ফসলের সবটাই বেচে দিতে হয় জমিদারের পাওনা মেটাবার জন্য। বীজের জন্য বা তার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য, বলতে গেলে, কিছুই থাকে না।

প্রঃ ৩৩—যখন জমিদার বা ফড়েরা চাষীদের উপর অত্যাচার করে তখন আইনের সাহায্য নিয়ে কি প্রতিকার করা যায়?

উত্তর—আদালতের সংখ্যা কম, আর সেগুলি প্রায়ই বহু দূরে অবস্থিত। এছাড়া জমিদার বা ফড়েরা হচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাঁদের আর্থিক সঙ্গতিও আছে। অন্যদিকে চাষীরা এত গরীব আর এত নম্র প্রকৃতির যে এমন জটিল ব্যয়বহুল চেষ্টা তারা স্বভাবতই করে না। তাই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে চাষীদের ক্ষেত্রে আইনী-সংরক্ষণ যেমনটি হওয়া উচিত, আদপেই ততটা নয়।

প্রঃ ৩৫—যতদূর আপনি স্মরণ করতে পারেন তাতে কি আপনার মনে হয় যে চাষীদের অবস্থা উন্নত হয়েছে?

উত্তর—আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে, চাষীদের অবস্থা একটুও উন্নত হয় নি।

প্রঃ ৩৬—বর্তমান খাজনা-ধার্যের প্রথার ফলে কি জমির মালিকের অবস্থা উন্নত হয়েছে?

উত্তর—নিশ্চয়ই, তাদের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। কেননা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীর উন্নতির সাথে সাথে নতুন রাজস্ব দাবির সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ায় তারা পতিত জমি চাষ শুরু ক'রে এবং প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি করে তাদের আয় যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি দেশী সম্পদও বৃদ্ধি করেছে।

প্রঃ ৪৩—বর্তমান অবস্থায় চাষীদের মূলধন সঞ্চয়ের কোন উপায় আছে কি?

উত্তর—একেবারেই না। আগেই বলেছি, মাঝে মাঝে যখন ফলন ভাল হলে ফসলের দাম পড়ে যায় তখন চাষীকে জমিদারের পাওনা মেটাতে

গিয়ে সব ফসল বেচে দিতে হয়, আর তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয় মজুর খেটে। আর যেবার ফলন কম, দামটাও একটু চড়া থাকে সেবারে তারা অবিশ্যি নিজের খাওয়ার জন্য কিছুটা ফসল রাখতে পারে—তবে তা সংবৎসরের মত কিছুতেই নয়। সংক্ষেপে এই তো হচ্ছে কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থা। এদের কথা তুললেই বড় দুঃখ হয়।

প্রশ্ন ৪৮—আচ্ছা, যদি য়ুরোপীয় মূলধন জমিদারী কিনে চাষবাস শুরু করে, তাহলে ভাল হবে, না খারাপ হবে?

উত্তর—যদি সৎচরিত্র য়ুরোপীয়কে এবং য়ুরোপীয় মূলধনকে ইণ্ডিয়া বোর্ড বা কোর্ট অব ডিরেকটরস্ কিংবা স্থানীয় সরকারের অনুমতি অনুযায়ী এ দেশে বসবাস করতে দেওয়া হয়, তাহলে দেশের সম্পদ যথেষ্ট বাড়বে আর উন্নত ধরনের কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন হলে এবং শ্রমিক ও প্রজাদের সাথে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখলে এদেশের অধিবাসীদের অবস্থাও উন্নত হবে।

প্রশ্ন ৫২—এদেশে ব্যাপকভাবে য়ুরোপীয় মূলধনের বিনিয়োগ কিভাবে দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে?

উত্তর—এদেশে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় অবসর গ্রহণ ক'রে এদেশে উপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর স্বদেশে নিয়ে যায়। যদি য়ুরোপীয় মূলধন বিনিয়োগ-ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহলে তারা সপরিবারে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে এবং তার ফলে দেশীয় সম্পদের উন্নতিও হবে যথেষ্ট।

রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রদত্ত তথ্যাবলীর প্রথম পর্যায়।

স্তবক ১৪—রাজস্ব আদায়ের সুবিধা এবং জমিদারগণ যাতে তাঁদের সম্পত্তির উন্নতি বিধান করতে পারেন তার জন্য ১৭৯৩ সালে সম্পাদিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সরকার অত্যন্ত উদারতার সাথে জমিদারদের করধার্যের অনিশ্চয়তার দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারটা কিছুতেই আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে কেন সরকার নির্দিষ্ট বৎসরগুলিতে প্রতিটি চাষীর বাৎসরিক প্রকৃত গড় আদায়

অনুযায়ী তাদের দেয় খাজনার পরিমাণ ধার্য করে প্রজাদের সুবিধা দিতে সরকারী আদর্শ অনুসরণের জন্য জমিদারদের বাধ্য করছেন না। অথবা চাষীদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখেও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে সরকার কেন প্রজাদের বর্তমান দেয় খাজনার সমপরিমাণ সর্বোচ্চ সীমা হিসাবে বেঁধে দিচ্ছেন না, যাতে পরোক্ষভাবে ভবিষ্যৎ খাজনা-বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হতে পারে।

স্তবক ১৫—অনেকেই সন্দেহ করেন যে সরকার হয়ত দেশের দীর্ঘ আচরিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করে বা গত চল্লিশ বছর ধরে তাঁরা যে আইন চালু করেছেন তার অনুশাসন ভঙ্গ করে চাষীদের অবস্থার উন্নতির জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, অন্যায় নজির ও আচরণ, তা যতদিনেরই পুরনো হোক না কেন, কোন সুসভ্য সরকারের কাছে ন্যায়ের মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না।

স্তবক ২৭—তাই, আমি এদেশের কৃষকদের বর্তমান দুর্দশা দূর করবার যে কোন উপায় নির্ধারণ করে তাঁদেরই মত মানুষের প্রতি, প্রজাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য সকল দেশীয় কর্তৃপক্ষ-মহলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ৩—একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলুন যে কোন্ কোন্ যুক্তিতে আপনি এই ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগকে ত্রুটিযুক্ত বলে মনে করেন?

উত্তর—প্রথমত, দেশে যথেষ্ট সংখ্যক বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেট-এর অভাব। দ্বিতীয়ত, বিদেশী ভাষায় কার্যপরিচালনার যোগ্যতায় তাঁদের অনেকেরই অভাব; আর তৃতীয়ত, যথোপযুক্ত আইনের অনুশাসনের অভাব, যে অনুশীলন দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হতে পারেন।

প্রশ্ন ৭—আপনি যেগুলি বললেন, সেগুলি ছাড়া ন্যায়বিচারের পক্ষে আর কোন বাধা আছে কি?

উত্তর—এর প্রথম বাধা হচ্ছে এই যে, যাঁরা বিচার করেন আর যাদের বিচার করা হয়, তাদের মধ্যে কোন সাধারণ ভাষা নেই। দ্বিতীয়ত, অংশত

এই কারণে এবং আচার-আচরণ ইত্যাদির বিপুল ব্যবধানের জন্য দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ অতি সীমাবদ্ধ, ফলত বিচারকগণকে যথেষ্ট কষ্ট করে ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অথবা অভিযোগের পক্ষে বা বিপক্ষের সাক্ষ্যের নিশ্চয়তা যার দ্বারা দাবি সমর্থিত বা অসমর্থিত হয় তার সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা করে নিতে হয়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বিচারক ও ব্রিটিশ আইনজীবীর মধ্যে যে সম্পর্ক, দেশীয় আইনজীবী ও বিচারকদের মধ্যে সে সম্পর্ক অনুপস্থিত। চতুর্থত, মামলার ধারাবাহিক বিবরণ দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রচার করবার মতো সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের একান্ত অভাব; এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে জজসাহেব সপ্তাহে একদিন আদালতে আসেন বা দুঘণ্টা কি একঘণ্টা কাজ করেন অথবা তিনি কিভাবে বাদী-বিবাদী পক্ষ, দেশীয় আইনজীবী ও আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাথে ব্যবহার করছেন কিংবা কোন নীতি অনুযায়ী তাঁরা মামলা পরিচালনা করেন ও তাঁদের সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন তার তদারকী জনমত করতে পারছে না আর জনমত এও দেখতে পারছে না যে বিচারকগণ মামলা সম্পর্কে নিজেরাই অনুসন্ধান করছেন, না বিচারবিভাগীয় কার্য দেশীয় কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৮—দেশীয় লোকদের উপর কি যে কোন ধরনের মামলা নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হচ্ছে?

উত্তর—হ্যাঁ। দেশী মুনসেফ বা কমিশনারগণ আছেন—তাঁরা ছোটখাট ঋণের মামলা করে থাকেন। সদর আমীনগণ আছেন, তাঁরা ৫০০ টাকা দাবির কম স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি-বিষয়ক মামলা করে থাকেন।

প্রশ্ন ২৭ ও ২৮—দেশীয় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কি কোম্পানীর আদালতের বিশুদ্ধতায় বা তাদের সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তায় বিশ্বাস আছে? দেশীয় জনসাধারণের কি অধস্তন বিচারবিভাগীয় কর্মীদের যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থা আছে?

উত্তর—এই ত্রুটি সম্পর্কে আমি ৫, ৬, ৭ এবং ২০ ও ২৪ প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে দেশীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের বিচার-বিভাগের সাধারণ কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকার কথা নয়।

প্রশ্ন—৩১—জুরীদের (বা ঐ ধরনের কিছু) দ্বারা কি বর্তমানে কোন ক্ষেত্রে বিচারে সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর—জুরীদের দ্বারা বিচারের প্রথা, একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে পঞ্চায়েতের নামে বহু প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশে চলে আসছে।

প্রশ্ন ৩৪—জুরীদের দ্বারা বিচারের প্রথা বা পঞ্চায়েতের প্রবর্তন সত্যই মঙ্গলজনক হবে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর—নিঃসন্দেহে। ৩০ নং প্রশ্নের উত্তরের তৃতীয় স্তবকে এ সম্পর্কে বলেছি। যদি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য য়ুরোপীয় বিচারক এবং বাইরের কোন প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার জন্য দেশীয় বিচারকের তত্ত্বাবধানে জ্ঞানী ও সম্মানিত দেশীয় ব্যক্তি নিয়ে পঞ্চায়েত গঠিত হয়, তাহলে একমাত্র সেই বিচারালয়েই সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির বিশুদ্ধতা অনুধাবন ক রে সমগ্র মামলাটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে; আর একমাত্র এই আদালতেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রশ্ন ৪২—আপনি কি বলতে পারেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ত্রুটি কী এবং তার প্রতিবিধানই বা কী ?

উত্তর—সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার সব সময়েই বেশ সতর্ক; তাঁদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার দরুণ তাঁরা তাঁদের আদালতের যে কোন ত্রুটি দূর করতে সক্ষম। এই কারণে এটা খুবই বাঞ্ছনীয় যে ইংরেজের আদালতের মত সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারক-গণেরও, যথেষ্ট কারণ থাকলে, 'হেবিয়াস কর্পাসে'র অনুশাসন জারী করবার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু বন্দী যখন সদর আদালত থেকে পঞ্চাশ মাইলের বেশী দূরে থাকে, তখন এই বিচারালয়ের বিচারকগণ, অযথা খরচ এড়াবার জন্য, তাঁদের নির্ভরযোগ্য কোন সার্কিট বিচারপতিকে তাদের মামলাটি তদন্ত ক'রে তাঁর কাছে রিপোর্ট পেশ করতে বলতে পারেন।

প্রশ্ন ৫৭—বিচারকগণ কি সাধারণত তাঁদের কর্তব্য ঠিকমত পালন করতে সক্ষম ?

উত্তর—এঁদের অনেকেই যথেষ্ট শিক্ষিত, কিন্তু যে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ভাষা, অনুভূতি ও চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেখানকার

কোন সাক্ষ্যের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা য়ুরোপীয় বিচারকগণ করতে পারবেন, এমন আশা করা অনুচিত।

প্রশ্ন ৬৮—দেশের চাহিদা পূরণের জন্য ফৌজদারী আইন কিভাবে রচিত হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর—ভারতের ফৌজদারী আইন এমন হওয়া উচিত যা এদেশে বসবাসকারী সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়েব কাছে সমান ও গ্রহণযোগ্য হবে। এর নীতিগুলি হবে সরল, উপস্থাপনা হবে স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা হবে সংক্ষিপ্ত—যাতে ক'রে ইসলামী বা খ্রীষ্টীয় কোন আইন-গ্রন্থের ব্যাখ্যাব অপেক্ষা না রেখেই এই বিচারবিধি নিজেই একটা অপরাধ সম্পর্কিত বিচারের আদর্শ স্থাপন করতে পারে।

প্রশ্ন ৭৬—আইনের বিরাটকায় ও ভীতিপ্রদ প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিকে সহজ সরল করার কোন উপায় আছে কি—যাতে ক'রে দেশীয় উকিলরা আদালতকে বিভ্রান্ত ক'রে সম্পত্তির দাবীকে ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে ?

উত্তর—এই বিরাট ও অত্যন্ত জরুরী দায়িত্ব পালন করতে হলে ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে যেমন বলেছি তেমনিভাবে, সেই একই নীতিতে, দেওয়ানী আইনও রচিত হওয়া উচিত। এবং উক্ত দুই প্রকার আইনই যথাযথ অনুবাদ ক'রে সরকারী কর্তৃত্বে বিপুল সংখ্যায় জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা দরকার। এগুলি নিতান্ত নগণ্য মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হলে শুধু যে ধনসম্পত্তি নিরাপদ হবে তাই নয়, আইনের মর্ম সমগ্র জনসাধারণের নিকট এত স্পষ্ট হবে যে, কোন মতলববাজ লোকের পক্ষে আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে মামলা মোকদ্দমায় প্ররোচিত করা সম্ভব হবে না। যতদিন পর্যন্ত না বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক বিকাশের ফলে একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি গ্রহণ না করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত উত্তরাধিকার আইনটি অবশ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সংশোধন ক'রে এখন যেমন আছে তেমনি রাখা উচিত।

ভারতের অবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্ন

প্রশ্ন ১৩—বর্তমান সরকার আর য়ুরোপীয় ও দেশী শাসকগণ সম্পর্কে এ দেশের অধিবাসীদের প্রচলিত অভিমত কী ?

উত্তর—সহর থেকে দূরে যে গ্রামবাসী বা চাষীরা থাকে তারা বর্তমান বা পূর্বতন সরকার সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তারা যে সুযোগ সুবিধাটুকু পায় বা যে অত্যাচারটুকু ভোগ করে তার জন্য দায়ী ক'রে থাকে সেই সব সরকারী কর্মচারীদের, শাসন ব্যাপারে যাদের সাথে তাদের সংযোগ প্রত্যক্ষ। কিন্তু কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি এবং বর্তমান ব্যবস্থার ফলে হীন অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছোটখাট সরকারী চাকরী নেওয়াটাকে অপমানকর বলে মনে করে থাকে। এবং এঁরা এ সম্পর্কে স্পষ্টতই নির্লিপ্ত। এদের মধ্যে যাঁরা আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে অবস্থা ভাল করেছেন বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ যাদের অবস্থা অনেকটা নিরাপদ হয়েছে এবং বৃটিশ শাসনে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতিকে প্রত্যক্ষ করবার মত দূরদৃষ্টি যাঁদের রয়েছে তাঁরা শুধু যে এই ব্যবস্থার অনুগত তাই নয় তাঁরা একে দেশের পক্ষে আশীর্বাদ বলে মনে করে থাকেন।

তবে এ দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকের মনোভাব সম্বন্ধে একথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, যে কোন ধরনের সরকারের প্রতি এদের আগ্রহী করে তুলতে হলে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মান ও দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করাই হবে একমাত্র নীতি।*

* অনুবাদ: সুশোভন সরকার। উত্তরকাল ১৩৭০।

॥ ষোল ॥

১৮৩২। শরৎকাল।

রামমোহন লণ্ডন হইতে প্যারিস যাত্রা করিলেন।

সঙ্গে চলিলেন ডেভিড হেয়ারের এক ভাই। ফরাসীদেশেও রাজা রামমোহনের খ্যাতি পূর্বেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিপ্লবের পীঠস্থান ফরাসীদেশ দেখিবার জন্য রামমোহন এমনই আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, ইংলণ্ডে থাকাকালেই তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোনো বিদেশীয় লোকের পক্ষে ছাড়পত্র ভিন্ন ফরাসীদেশে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। পাশপোর্ট লইয়া ফরাসীদেশে যাইতে রামমোহনের রাজনৈতিক চেতনা স্বভাবতই আহত হইল। ছাড়পত্র চাহিয়া রামমোহন ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১। এই পত্রখানিও রামমোহনের অন্যান্য রাজনৈতিক রচনার ন্যায় মূল্যবান। এই পত্রের প্রথম অংশে তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন: "শুধু ধর্ম নয়, নিরপেক্ষ সাধারণ জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞান হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সমস্ত মানবজাতি একই পরিবার। জাতিসমূহ তাহারই বিভিন্ন শাখা। সকল দেশের শিক্ষিত লোকই ইচ্ছা করেন তাহাদের পারস্পরিক সংসর্গ ও যোগাযোগ দ্বারা সমস্ত বিশ্বমানবের মিলনের ও প্রীতিসম্ভোগের সুবিধা বর্ধিত হয় এবং সেই পথে যে সব বাধাবিঘ্ন তাহা বিদূরিত হয়।"

জাতিসংঘ বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা যখন পৃথিবীতে কোনো মানুষ চিন্তা করে নাই, তখনই উহা রামমোহনের চিন্তায় ধরা দিয়াছে। নিখিল-বিশ্বের মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে রাজার সুস্পষ্ট ধারণা এই পত্রখানিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা শুধু দূরদৃষ্টি নয়, অসামান্য প্রতিভা।

রামমোহন প্যারিসে আসিলেন।

ফ্রান্সের রাজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ রামমোহনের চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব দেখিয়া, সকলের উপর আর্যসৌষ্ঠবমণ্ডিত তাঁহার সেই উন্নতশীর্ষ

বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিলেন। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিদ্বৎসমাজ 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক' রামমোহনকে পূর্বেই সভ্য মনোনীত করিয়াছিলেন। সম্রাট লুই ফিলিপ সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন; একাধিকবার তাঁহাকে রাজকীয় ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে তাঁহার সহিত ভোজন করিলেন। এক হোটেলে মিলিত হইয়া রামমোহন সুপ্রসিদ্ধ কবি স্যার টমাস মুরের সহিত আহার করিয়াছিলেন। রামমোহন ফ্রান্সে চার মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৮৩৩-এর প্রথম ভাগেই রামমোহন লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আবার তিনি তাঁহার কর্তব্য কার্যে লাগিয়া গেলেন।

রামমোহনের ইংলণ্ড যাওয়ার দুইটি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। সতীদাহ-নিবারণের বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল হিন্দুদের আপিল অগ্রাহ্য হইয়াছিল আর দিল্লীর বাদশাহের জন্য অতিরিক্ত বৃত্তিও মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে শাসন-সংস্কার বিষয়ে রামমোহনের অধিকাংশ প্রস্তাবই পার্লিয়ামেণ্টে গৃহীত হয় নাই। এইখানেই রামমোহনের রাজনৈতিক কর্মজীবনের শেষ। প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও রামমোহন যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া যান, পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতি বহুল পরিমাণে সেই পথেই চলিয়াছে এবং বাংলা দেশে সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহাদের জীবনেও অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এইখানে সুরেন্দ্রনাথের উক্তিটি আর একবার স্মরণ করি: "ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয় যে, আমরা এখন যেসব রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছি, একশত বৎসর পূর্বেই রামমোহন সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করিয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কারই রামমোহন চাহিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁহার দাবী ছিল—এদেশবাসী ইংরেজ রাজকর্মচারীর যেন আইন তৈরি করিবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা না থাকে। আবার ব্রিটিশ আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার যাবতীয় সুপারিশের মূল বক্তব্য ইহাই ছিল—ভারতবর্ষ যেন উদ্ধত

রাজকর্মচারীর দুর্ব্যবহারে লাঞ্ছিত না হয়, যেন ব্রিটিশ সামাজিক আইনের সার্বভৌমত্ব ও কল্যাণ হইতে ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় প্রজা বঞ্চিত না হয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণ ও প্রতিভা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামমোহন তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ মনীষী ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন; ইঁহাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদের জনক রবার্ট ওয়েন একজন। ওয়েন রামমোহনকে সোস্যালিজম-এর প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্ভবত ধর্মের প্রতি ওয়েনের বিশ্বাস ছিল না বলিয়া রামমোহন তৎপ্রবর্তিত সোস্যালিজম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার সহিত কথাবার্তায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি যে ওয়েনের কার্যসূচি সমর্থন করিতেন তাহার প্রমাণ আছে রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লিখিত রামমোহনের একখানি পত্রে। রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনুসরণের পক্ষে এই চিঠিখানির গুরুত্ব অসাধারণ।*

ওয়েনের সহিত কোথায় তাঁহার মতদ্বৈধ, তাহারও উল্লেখ আছে এই পত্রে। পত্রখানির অনুবাদ এইখানে দেওয়া হইল।

৪৮ বেডফোর্ড স্কোয়ার
এপ্রিল ১৯, ১৮৩৩

প্রিয় মহাশয়,

গতকল্য আপনার বাড়ীতে আপনার অথবা আপনার কোন বন্ধুর সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য না হওয়ায় আমি মঙ্গলবার রাত্রে আপনার নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে দুই একটি মন্তব্য করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি এবং আমার মনে হয় আপনি উহাতে একমত হইবেন। উহা এইরূপ—ইংলণ্ডে অথবা আমেরিকায় উহাদের জনসাধারণের সামাজিক, পারিবারিক এবং রাজনৈতিক কল্যাণসাধনের জন্য ধর্মের, বিশেষভাবে যে

* রাজার এই মূল্যবান পত্রখানির বিষয় দীর্ঘকাল যাবৎ আমরা কিছুই জানিতাম না। নিউইয়র্কের পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত এই পত্রখানির সন্ধান সর্বপ্রথম যিনি পান তিনি অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস এবং তিনিই ইহার একটি আলোকচিত্র সংগ্রহ করেন; নূতন সংস্করণ 'রামমোহন রায় চরিতে'(কলেট প্রণীত) ইহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ধর্মপদ্ধতি বিশ্বপ্রেম এবং উদারতা শিক্ষা দেয় তাহার বিরোধিতা করিবার প্রয়োজন নাই। লক এবং নিউটনের ন্যায় কল্যাণব্রতীরা কি ধর্মের বিরোধিতা করিয়াছিলেন? না! বরং ধর্মে যে সমুদয় ব্যভিচার ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। মুহূর্তের জন্য যদিও স্বীকার করা যায় যে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ স্বাধীন চিন্তাবিদের নিকট সন্তোষ-জনকভাবে প্রমাণ করা যায় না, তথাপি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ফলে আমার ধারণা এই যে আমরা প্রেম ও উদারতাসম্পন্ন ধর্মপদ্ধতি (খ্রীষ্টধর্ম) আমাদের সুখবর্ধনে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের অধিকতর সুযোগ দানে এবং আমাদের অশালীন কামনা ও মনোবৃত্তি দমনে সক্ষম বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। আমি ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে আপনার অতি উদার পিতা ধর্মের বিরোধিতা দ্বারা তাঁর নিজেরই সাফল্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি উপরোক্ত অর্থে খ্রীষ্টধর্মের অনুগামী। হ্যামিলটনের ইষ্ট ইণ্ডিজ গ্রন্থ (প্রথম খণ্ড) আপনাকে পাঠাইবার অনুমতি দান করুন; উহার ৩৫ পৃষ্ঠার ৩১ লাইনে দেখিবেন আপনার পিতা বর্তমানে যে মতবাদ উপস্থিত করিতেছেন দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ভারতের ব্রাহ্মণেরা প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করিয়া গিয়াছেন এবং ঐ মত কোনক্রমেই ধর্মবর্জিত ছিল না। আপনার এবং আপনার পিতার উদার কার্যকলাপের সাফল্য আমি দেখিতে চাই বলিয়াই আমি এই মন্তব্যসমূহ করিতে সাহসী হইয়াছি; আমি আশা করি আমার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া আপনারা আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। ইতি

আপনার বিশ্বস্ত

রামমোহন রায়

পুনশ্চ—আমি ইনফ্লুয়েঞ্জার দারুণ আক্রমণে কষ্ট পাইতেছি, কয়েক মিনিট বসিতে বা কয়েক লাইন লিখিতেও বাধা পাইতেছি।

ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া রামমোহন যে কয়দিন লণ্ডনে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে অতিবাহিত করিতেন। 'রিফর্ম

বিল' সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে তিনি নিয়মিতভাবে উক্ত সভাগৃহে উপস্থিত থাকিতেন। এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত ও চিন্তিত দেখা যাইত। কুমারী ক্যাসেলকে তিনি এই সময়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। উক্ত পত্রে রামমোহন লিখিয়াছিলেন: "আজ কমন্স সভায় 'রিফর্ম বিল' তৃতীয়বার পঠিত হইবে। কমিটিতে বিবিধ প্রকার ছল করিয়া সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর তর্কবিতর্ক দ্বারা কার্যের ব্যাঘাত উপস্থিত করা হইতেছে। কমন্স সভায় এই পাণ্ডুলিপি পাশ হইলে, লর্ডদিগের সভায় কি হইবে তাহা আমি শীঘ্রই নির্ধারণ করিতে পারিব। তখন আমি উহার শেস ফল শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করিব। পর সপ্তাহে আমি ব্রিস্টল যাত্রা করিব।"

১৮৩৩। জুলাই মাস।

সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে আপিল অগ্রাহ্য হইল।

আগষ্ট মাসে 'রিফর্ম বিল' পাশ হইয়া গেল।

এখন হইতে কোম্পানী বাণিজ্য অপেক্ষা ভারতশাসনের দিকেই বেশি করিয়া মনোযোগ দিলেন। রামমোহনেরও লণ্ডন প্রবাস শেষ হইল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে 'রিফর্ম বিল' যদি গৃহীত না হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত কোনো সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া রামমোহন সংকল্প করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রামমোহন কতভাবে যে ভারতের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, তাহার কিছু আভাস আমরা তাঁহার ইংরেজ-চরিতকারের রচনায় পাই: "রামমোহন তাঁহার জীবনে যে সমস্ত কার্য করিয়াছিলেন, তিন বৎসরকাল বিলাতে প্রবাস তাহার উৎকৃষ্টতম পরিসমাপ্তি।...তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের প্রাণস্পর্শী দৃশ্য। ইহা দ্বারা তিনি যে শুধু একটা সংস্কারের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা নয়। সাম্রাজ্য সম্পর্কেও ইহার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এদেশে রামমোহনের উপস্থিতি হইতে ইংরেজগণ প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, প্রাচ্য দেশে তাহারা যে জাতিকে পরাজিত করিয়া অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছেন তাহাদের মর্যাদা, সভ্যতা ও ধর্মপরায়ণতা কত উচ্চ শ্রেণীর। ভারত যেন রামমোহনের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিল এবং আমরা

তাহার মহিমা দেখিলাম। রাজদরবারে, পার্লিয়ামেণ্টের গৃহে, অভিজাত-দলের সংসর্গে, দার্শনিক সাহিত্যিকদের সমাজে, সকল ধর্মমণ্ডলীর উপাসনা-গৃহে, সম্ভ্রান্ত পরিবারে আর বিস্ময়াবিষ্ট ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমজীবিদের সম্মুখে রামমোহন আমাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের দৃশ্যমান প্রতিমূর্তির মত দাঁড়াইয়া-ছিলেন।...স্বদেশে তিনি যেমন ইংলণ্ডের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডেও সেইরূপ ভারতের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতির প্রথম মুখপাত্রস্বরূপ তিনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে আসিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুতর সময়ে তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন।... ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিব, বর্তমান সভ্যতার ইতিহাসে রামমোহনের এই ইংলণ্ড আগমন একটা বিশেষ অবস্থান্তর নির্দেশক ঘটনা।"

প্রসঙ্গত আর একটি কথার উল্লেখ করিব। রক্ষণশীল অনুদার হিন্দুসমাজ রামমোহনকে জাতিচ্যুত করিয়া বিধর্মী কালাপাহাড় বলিয়া ঘোষণা করিয়া-ছিল। তাহারা বুঝিতে চাহে নাই যে, সকল ধর্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া রামমোহন যে সত্যরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বজনীন ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইখানেই সকল ধর্মের মিলনভূমি। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে যে অমূল্য সম্পদ গুপ্ত ছিল, রামমোহনই তাহা প্রথমে উদ্ধার করিলেন। ইংলণ্ডে বাসকালে একদিন হিন্দুসমাজের ধিক্কৃত এই রামমোহনই এক বিদ্বৎসভায় গৌরবের সঙ্গে বলিয়া-ছিলেন: "য়ুরোপীয় সাহিত্যে আমি এমন কিছু দেখিলাম না, যাহা হিন্দু-দিগের দার্শনিকতত্ত্বসমূহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।" বিরাট বিশ্বের সম্মুখে এমন গৌরব-বাণী যিনি শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিলেন, সেই রামমোহনের মতন হিন্দু, তখনকার হিন্দুসমাজে আর কেহ ছিল না। এইখানেই রামমোহনের পুরুষসিংহত্ব। ইহার বহুকাল পরে বিবেকানন্দ।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী ও প্রবীণ নেতা জেরেমি বেন্থাম রামমোহন রায়কে এমনই শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, তিনি যাহাতে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন তাহার জন্য রামমোহন ইংলণ্ড পৌঁছাইবার

কয়েক মাসের মধ্যেই সাধারণভাবে একটি পার্লামেণ্টারি ক্যাণ্ডিডেট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, সর্বশ্রেণীর ইংলণ্ডবাসীর নিকটে রামমোহন বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধনা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের গির্জায় গির্জায় তাঁহার জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ইহা হইতে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, রামমোহনের পক্ষে বিপুল ভোটাধিক্যে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করা আদৌ কঠিন ছিল না। এবং তিনি যদি তখন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হইতেন, তাহা হইলে অবিভক্তভাবে ভারতের স্বাধীনতা অনেক বৎসর পূর্বেই আসিত—এ সিদ্ধান্তও অসঙ্গত নয়।

রামমোহন রায়ের নাম তখন পৃথিবীতে এমনই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সেই সময়ে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে অনুষ্ঠিত ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী মার্কিনী কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তৃতা শেষ করিবার সময়ে একজন প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন: "In closing this address, allow me to assume the name of the most enlightened and benevolent of the human voice now living, though not a white man—Rammohan Roy." লক্ষ্য করিবার বিষয়, সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে কি য়ুরোপ কি আমেরিকা, সর্বত্র রাজা রামমোহন রায় 'সমগ্র মানবজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও লোকহিতকারী' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহা কি কম গৌরবের কথা? দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালি সেই গৌরবের তাৎপর্য আজো উপলব্ধি করিতে পারিল না। আবার বেন্থামের ন্যায় মনীষী, বিপ্লবী গুয়াতেমালার শিক্ষক দেল্ ভালে আর ভারতের শিক্ষক রামমোহনকে 'kindred souls' অর্থাৎ একই শ্রেণীর মানুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই ছিল সেদিন ভারতের বাহিরে রামমোহনের পরিচয়। স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে সংগ্রাম, যেখানে বিপ্লব, সেইখানেই ভারতের রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বন্ধু বলিয়া সম্মানিত ও স্বীকৃত। তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা রামমোহনের এই আন্তর্জাতিক সম্মানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

অনেকদিন হইতেই রামমোহন ব্রিস্টলে যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। কারণ, তাঁহার পালিতপুত্র রাজারাম সেইখানে অবস্থান করিতেছিলেন। রামমোহন ইংলণ্ডে পৌছিয়াই রাজারামের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাকে ব্রিস্টলে একটি বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। লণ্ডনের কাজ একরকম শেষ হইল। রামমোহন এইবার যেন একটু অবসরের জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন। আঠার বৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্মজীবনে বিশ্রাম-সুখ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেই হয়। লণ্ডনের কোলাহল ও ব্যস্ততা অপেক্ষা ব্রিস্টল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নির্জন। রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু, বিশিষ্ট ধর্মযাজক ডাক্তার কার্পেণ্টার পূর্বাহ্নেই রামমোহনের জন্য ব্রিস্টলে একটি মনোরম ভবন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন; উহাই কুমারী ক্যাসেলের বিখ্যাত 'ষ্টেপলটন গ্রোভ'। এইখানেই রামমোহন তাঁহার অতিথি হইয়া আসিলেন। ১৮৩৩-এর সেপ্টেম্বরের প্রথমেই তিনি ব্রিস্টল আসিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে আসিলেন ডেভিড হেয়ারের ভগিনী কুমারী হেয়ার। পরম আত্মীয়ের মত ইনি রামমোহনের সেবা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের পরিচর্যায় রামমোহনের প্রবাসের দিনগুলি সুখময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনবিধাতা ইহজীবনে রামমোহনের ভাগ্যে বেশি দিন বিশ্রাম-সুখভোগ লিখেন নাই।

রামমোহনের ব্রিস্টল-জীবনের একদিনের একটি ঘটনা স্মরণীয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর। এইদিন রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ষ্টেপলটন গ্রোভে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার, প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জন ফস্টার প্রভৃতি বহু বিচক্ষণ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ভারতের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও আশা সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ডাঃ কার্পেণ্টারের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা ক্রমাগত তিন ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত প্রশ্ন ও মন্তব্যের যথাযথ উত্তর দিলেন। উত্তর দিলেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শিষ্টাচার ও অমায়িকতার সহিত। হিন্দুধর্মের কতকগুলি সিদ্ধান্তের বিশদ ব্যাখ্যাও তিনি প্রদান করিলেন। সকলের হৃদয় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ইহজীবনে ইহাই রামমোহনের শেষ কাজ।

রামমোহনের এক চরিতকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "যে অসাধারণ প্রতিভা প্রাচীন ও আধুনিক বিবিধ ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়া লোককে আশ্চর্য ও স্তব্ধ করিয়াছিল, যে অসাধারণ প্রতিভা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া ভাগীরথী তীরে পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরমেশ্বরের বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন, অদ্য ব্রিস্টল নগরে সমবেত মহাপণ্ডিতগণ সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্যে স্তম্ভিত হইলেন।"

ব্রিস্টলে প্রথম দুই রবিবার রামমোহন স্থানীয় গির্জায় উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের দেওয়া সেই বইখানি (*Watt's Hymns*—ওয়াট সাহেবের রচিত শিশুদের জন্য ঈশ্বর-সঙ্গীতাবলী) ব্রিস্টল পর্যন্ত রাজার সঙ্গে ছিল এবং এইখানকার উপাসনাগৃহেও তিনি ঐ বই হইতে দুই-একটি সঙ্গীত শিশুর মত সরল চিত্ত লইয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ওয়াট সাহেবের গান সত্যই তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল।

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও সমাজ-সংস্কারকরূপে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে রামমোহন কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্বিক ইতিহাস আজো সংগৃহীত হয় নাই। যেটুকু হইয়াছে তাহার জন্য আমরা দুইজন ইংরেজ লেখিকা—সোফিয়া ডবসন কলেট ও মেরী কার্পেন্টার এবং ফরাসী লেখিকা মাদাম মোর্ঁ্যার নিকট কৃতজ্ঞ। আর আমেরিকায় রামমোহনের ভাবধারা কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও তাঁহার সম্পর্কে সেই সময়ে এমার্সন-প্রমুখ আমেরিকার বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন কিরূপ কৌতূহলী হইয়াছিলেন—সেই সম্পর্কেও আমরা মার্কিন মহিলা আড্রিয়েন মুরের নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী মুর যত্নপূর্বক রামমোহন সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। রামমোহন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রচনাবলীর যে তালিকা তিনি তাঁহার

গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে রামমোহনের আন্তর্জাতিক খ্যাতির অর্থাৎ তাঁহার চিন্তাধারার আন্তর্জাতিক পরিব্যাপ্তির কথা আমরা জানিতে পারি। এখন এই কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারা গিয়াছে যে, 'রামমোহন ফ্রান্সে গমন করবার কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ-রূপে তাঁর সুনাম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই ফ্রান্সের 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক' (প্রাচ্য বিদ্যানুশীলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটির অনুরূপ সারস্বত সভা) নামক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত বিদেশী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।' ইহা রামামাহনের য়ুরোপ যাইবার ছয়-সাত বৎসর পূর্বের ঘটনা।

আমার ধারণা (এবং রামমোহন-অনুরাগী অনেকেরই ধারণা) রাজার য়ুরোপবাসের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হইলে 'আন্তর্জাতিক রামমোহন' সম্পর্কে আরো অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারিব। ইহা আমাদের একটি প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। তথাপি যে দুই-একজন উৎসাহী গবেষক এখন এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।*

"ভারতের বাইরে রামমোহনের খ্যাতির বিষয় আলোচনা করতে গেলে স্বভাবত ইংলণ্ডের কথাই আমাদের বেশি মনে পড়ে। সেখানে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, কেন না তাঁর প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ইংরাজের অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। কিন্তু য়ুরোপের অন্যান্য দেশে এবং সম্ভবত আমেরিকাতেও তাঁর খ্যাতি যে বহু বিস্তীর্ণ ছিল, সে খবর আমাদের কমই জানা আছে।...উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ভারতীয় বেদান্তদর্শন ও জীবনচর্চার প্রতি য়ুরোপের সুধীসমাজে যে একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠেছিল সেই ভারত-বিজ্ঞানের ইতিহাসে রামমোহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।"

*সম্প্রতি এইরূপ একটি গবেষণার পরিচয় পাইলাম শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস-লিখিত 'রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)।

ইহার পর রামমোহনের জীবনের কাহিনী অল্পই অবশিষ্ট আছে। মাত্র আট দিনের অসুখে তাঁহার মৃত্যু হয়। রামমোহনের কোনো চরিতকারই তাঁহার জীবনে কখনো অসুস্থ হইবার কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি আজীবন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং এই কারণেই একসঙ্গে এতগুলি কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। দৈত্যের মতই তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন। মিস কলেট তাঁহার জীবনচরিতে রাজার মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মৃত্যুর পরদিন মৃতের শরীর পরীক্ষা করিয়া বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন : "The cause of the death was found to be fever producing great prostrations of the vital powers, and accompanied by inflammations of the brain."

মস্তিষ্কের প্রদাহের কারণ, চিকিৎসকদের মতে, মানসিক দুশ্চিন্তা। এই মানসিক দুশ্চিন্তার হেতু অর্থনৈতিক উদ্বেগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিলাত যাত্রাকালে বাহাদুর শাহ রামমোহনকে যে পারিশ্রমিক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেন নাই; আর কলিকাতা হইতে তাঁহাকে নিয়মিতভাবে টাকা পাঠাইবার জন্য তিনি যেসব বন্ধুদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও ঠিকমত সেই দায়িত্ব পালন করেন নাই। অথচ রাজা রামমোহন বিলাতে রাজার মতই থাকিতেন। চিরদিনই তিনি দরাজ হাতে খরচ করিতেন। ইংলণ্ডে খরচের মাত্রা সমানই ছিল, অথচ শেষের দিকে টাকা পয়সার অনাটন হেতু তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না।

২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ১৮৩৩।

ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু হইল।

অপূর্ব চরিত্র,—অপূর্ব মৃত্যু!

রাত্রি দুইটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময় প্রবাসে রাজা রামমোহন রায়ের

মৃত্যু হইল। চন্দ্রালোকিত সেই সুন্দর রাত্রির নিস্তব্ধ ও শান্ত প্রহরে প্রতিভার একটি প্রদীপ্ত শিখা নিবিয়া গেল। বালক রাজারাম, রামহরি, রামরত্ন, কুমারী হেয়ার প্রভৃতি নীরবে শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মানবগুরুর এই মহান্ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিলেন। রাজার শেষ নিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল শুধু অনাদি প্রণবধ্বনি—ওঁ। 'ইহাতে বুঝা যায় যে, জীবনে বহুলোকসমাগমের মধ্যে এবং মৃত্যুর নির্জন দ্বারে সর্বত্রই ভগবৎ চিন্তাই তাঁহার আত্মার প্রধান কার্য ছিল।' মাত্র আট দিন জ্বর ভোগ করিবার পর রামমোহনের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, অসুস্থ হইবার দুই দিন পূর্বেও তিনি ডাক্তার প্রিচার্ডের *Physical History of Man* পাঠ করেন ; লেখক স্বয়ং উহা পড়িবার জন্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। মানুষের কথা যিনি সারা জীবন ধরিয়া ভাবিয়াছেন, মানুষের ঐহিক কল্যাণকামনায় তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই মানব প্রেমিক রামমোহনের পক্ষে ইহাই তো স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। মনে রাখা দরকার, বাংলার মাটিতে, কলিকাতায় আদর্শবাদী এবং ভারতপ্রেমিক ইংরেজ ডেভিড হেয়ার নয় বৎসর পরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ডেভিড হেয়ারের বন্ধু এবং শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টায় তাঁহার অন্যতম সহযোগী আদর্শবাদী রামমোহন আজ দেহ রক্ষা করিলেন ডেভিড হেয়ারের জন্মভূমি ইংলণ্ডে। মৃত্যুকালে পরম আত্মীয়ের মতো রাজার সেবাশুশ্রূষা করিলেন হেয়ার সাহেবেরই ভাই ও বোন। বাংলার সহিত ইংলণ্ড, ভারতের সহিত য়ুরোপ, প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্য, আজ এইভাবেই রাখীবন্ধনে ধরা দিল। ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যু আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ব্রিস্টল আজ ভারতবাসীর পরমতীর্থ।

রাজার মৃত্যুদৃশ্য মিস কলেট মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :

"এইভাবে সেই মহান্ হিন্দুর আত্মা চলিয়া গেল। বাল্যে পৈতৃক ধর্ম ও পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, যৌবনে বিপুল সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া তিনি যেসব পরিবর্তনের ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, আজ তাহা চরম পরিবর্তনে পরিণত হইল। বিশ্রামহীন সাহসী সত্যান্বেষী আজ শান্তিময় গম্যস্থানে পৌঁছিলেন। এই মহাপ্রস্থানের মধুর, কবিত্বপূর্ণ,

করুণ দৃশ্য ভারতবাসীর কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ে ও স্মৃতিতে সুদীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিবে। বাহিরে—সেই আশ্চর্য সুদূর প্রতীচ্য দেশ, শারদীয় চন্দ্রমার স্নিগ্ধ আলোকে নিদ্রিত, দীপ্ত মনোরম পল্লীদৃশ্য, রজতশুভ্র চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত নিভৃত উদ্যানগৃহ, সমস্তই শান্ত ও নিথর; প্রকৃতি ও রাত্রি উভয়ে মিলিয়া যেন অনন্ত নিস্তব্ধতাই ইঙ্গিত করিতেছিল। ভিতরে—সেই মহান্ মুক্তিদাতা মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, আর প্রহেলিকাময় যে স্বাধীনতা ও শান্তির আশা ও প্রতীক্ষায় জীবন পর্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই লাভ করিতেছিলেন। ভবিষ্যতে জ্ঞানদীপ্ত মুক্ত প্রাচ্যদেশবাসী রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসী অসংখ্য বংশধরগণের পক্ষে এই করুণ ও অদ্ভুত দৃশ্য একটি পবিত্র স্মৃতিস্বরূপ বর্তমান থাকিবে।"

দিগ্বিজয়ী তর্কযোদ্ধা, স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার পূজারী রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইল।

॥ সতেরো ॥

রামমোহনের কল্যাণময় কর্মজীবনের কাহিনী শেষ হইল।

এইবার তাঁহার মহত্ত্বের কথা কিছু আলোচনা করিব।

রামমোহনের মহত্ত্বের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই ব্যাসদেবের একটি উক্তি স্মরণ হয়। বাংলায় অনুবাদ করিলে উক্তিটির অর্থ এই দাঁড়ায়: 'বাক্যের অতীত তুমি, নাহি তব সীমা'। ভারতবর্ষের সর্বাত্মক কল্যাণকামনার মধ্যেই আমরা এই যুগমানবের চরিত্রের সর্বপ্রধান অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। হিমগিরির তুষারকিরীটী শেখরের সহিত রামমোহন-চরিত্রের তুলনা করিতে পারা যায়—তেমনি সমগ্র, তেমনি সম্পূর্ণ, আর তেমনি মহৎ। রামমোহন এক কথায় যুগচেতনা এবং যুগের প্রয়োজনেই তাঁহার জীবনের গতি নির্ধারিত হইয়াছিল। সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয় বলিয়াই জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অতুলনীয়। তুলনার প্রশ্নই অবান্তর, কারণ রাম-মোহনের সমকালীন ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, আর দ্বিতীয় মানুষই বা কে ছিল? রাজার মৃত্যুর পর একশত তেত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল—এই দীর্ঘকালের মধ্যে দ্বিতীয় রামমোহনের অভ্যুদয় আর হইল না। তাঁহার কার্য ও কীর্তির কথা স্মরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পলাশি যুদ্ধের পর হইতে দুইশত বৎসরকালের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু মনীষীর আবির্ভাব সত্ত্বেও রামমোহন আজো অতুলনীয় রহিয়া গিয়াছেন। এমন একটি উৎকৃষ্ট নমুনার মানুষ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসেও বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে জন্মে নাই। তিনি নরোত্তম।

আমরা এ-পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখিতে পাই, দুইটি ভাবের সমন্বয়ে রামমোহন-চরিত্র গঠিত। প্রথম—বিশ্বজনীন ভাব। তিনি জগতের হিতৈষী এবং জগতের সংস্কারক। দ্বিতীয়—তাঁহার জাতীয়তাবোধ। তিনি জাতীয় সংস্কারক ও উন্নতিসাধক। রামমোহন ভারত তথা এশিয়ার প্রথম সার্বভৌম মানুষ। প্রথম আন্তর্জাতীয়তাবাদী। প্রথম বিশ্বনাগরিক। রামমোহন-চরিত্র দাঁড়াইয়া আছে সার্বভৌমিক আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের উপর। এই দুই দিক হইতে রামমোহনকে বুঝিতে হইবে।

রামমোহনের মহত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : "রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন ; সেই জন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল ; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিন্তাশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।"

সাত মাস পরে কলিকাতায় রামমোহনের মৃত্যুতে একটি মহতী শোকসভার আয়োজন হইয়াছিল। সভা হইয়াছিল টাউন হলে, ৫ই এপ্রিল, ১৮৩৪। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন স্যর জন পিটার গ্র্যাণ্ট। স্বাধীনচেতা বিচারক বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। সভায় রামমোহনের অনুরাগী বহু বিশিষ্ট য়ুরোপীয় ও ভারতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটি এইরূপ :

"That it is the opinion of this meeting that the name of Rammohan Roy should be perpetuated by whatever means will best indicate the high sense entertained of him by this meeting, as a Philosopher and Philanthropist, and of his increasing endeavours to improve the moral and intellectual condition of his countrymen and to advance and promote the general good of his country."

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন 'বোর্ড অব রেভিন্যু'র বয়োজ্যেষ্ঠ সভ্য মিঃ জেমস প্যাটল। ইনি প্রায় রামমোহনের সমবয়সী ছিলেন এবং অষ্টাদশ শতকের

শেষ পাদে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন। রামমোহনকে প্যাটল সাহেব ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া রামমোহনের উদ্দেশে তিনি এই মন্তব্য করেন: " . I venture to submit that Rammohan Roy was a very great man. His fortitude and enlightened mind must call forth admiration in any part of the civilized world; and no one, knowing his merits, can refuse him this tribute of praise....He rejected all the endearing persuasions of his parents, because his enlightened mind told him he had a great purpose to perform—to remove the darkness from his benighted countrymen, to give them the light he had obtained, the moral and intellectual world he had discovered; to make them quit practices abominable to human nature, and such as his enlightened mind could only look on with abhorrence and disgust."

প্যাটল সাহেবের মতেও দেখিতেছি যে, তাঁহার স্বজাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাওয়া—এই সুমহৎ কর্মের ভিতর দিয়াই রামমোহনের মহত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে আর সার্থক হইয়াছে তাঁহার জীবন।

প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক ও ডেভিড হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রসিককৃষ্ণ মল্লিক। রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওর প্রিয়তম ছাত্রগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। তিনি বলিলেন: "রামমোহন রায় একটি অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁহার সমতুল্য মানুষ আমরা আর দেখিতে পাইব না। সমস্ত কুসংস্কারের বিভীষিকার ঊর্ধ্বে তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশবাসীদের ধারণার অতিরিক্ত অনেক কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। বেদ পাঠ করিবার ফলে তিনি সর্বসংস্কারমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বমানবের বন্ধু ছিলেন রামমোহন। সতীদাহ-নিবারণ আইন প্রবর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি সংস্কারমূলক কার্যে ইহার পরিচয় আছে।"

প্রস্তাবটি সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই রকম ছিল :

"That subscription be opened to forward the object of this meeting in such a manner. as may be determined by a majority of subscribers."

এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শুল্ক, লবণ ও আফিম বিভাগের সদস্য এবং 'মেরিন বোর্ডে'র সদস্য মিঃ হেন্‌রি মেরেডিথ পার্কার। অত্যন্ত গুণী লোক ছিলেন ইনি। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সুপ্রীম কোর্টের রেজিষ্টার মিঃ টমাস ই. টার্টন, বার-এ্যাট্‌-ল। রামমোহন এই টার্টন সাহেবকেই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে লড়াই করিবার জন্য কৌসিলী নির্বাচন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজে টার্টন একজন সুবক্তা হিসাবেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেদিন প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে উঠিয়া টার্টন রাম-মোহনের বহুমুখী প্রতিভার কথা অত্যন্ত আবেগভরে বর্ণনা করেন এবং উপসংহারে বলেন : "If the public of Calcutta do not with one heart and soul come forward to honour and revere the memory of such a distinguished man, its character will be depreciated in the estimation of the world."

এই প্রস্তাবটিও গৃহীত হইয়াছিল।

সভায় তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ :

"That certain gentlemen (of whom the following are at present in India) be constituted a Committee to collect subscription and to call a meeting of the subscribers as soon as sufficient time shall have elapsed, for the receipt of contribution from all parts of India"

এই প্রস্তাবে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম : Sir J. P. Grant, T. E. M. Turton, L. Clark, J. Sutherland, G. J. Gordon, W. H. Smonlt, Rustamjee Cowasjee, Russick Krishna Mullick ও Biswanath Mutty Lall.

'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার সম্পাদক (এবং পরবর্তী কালে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ) সাদারল্যাণ্ড এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ইহাও সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং রামমোহনের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে সভাস্থলেই ছয় হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। ইনিই রাজার ইংলণ্ডযাত্রার সঙ্গী ছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নেপথ্য হইতে এই শোকসভার সকল আয়োজন করিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজার মৃত্যুসংবাদে তিনি এমনই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে, সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই এবং সেই একই কারণে রামমোহন-স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে তাঁহার নামেরও উল্লেখ নাই। এই কমিটিতে উল্লিখিত প্রায় সকলেই দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণের রামমোহন-বিদ্বেষ এমনই প্রচণ্ড ছিল, যে তাঁহাদের কেহই এই শোকসভায় সেদিন যোগদান করিতে আসেন নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিণত বয়সে রামমোহন সম্পর্কে তাঁহার বালক বয়সের স্মৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "বাস্তবিক আমি এ পর্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। তিনি বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী-সকল শক্ত ছিল। রাজা আপনার শরীরকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। শরীরকে পরমেশ্বরের মূল্যবান দান বলিয়া মনে করিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। সকল মহাপুরুষের ন্যায়, রাজা রামমোহন রায়ও স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিনীত ছিলেন।...আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল।"

এই বালক দেবেন্দ্রনাথ একবার তাঁহার পিতার আদেশে রামমোহনকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। সেইদিন রাজার মুখে বালক সেই

যে শুনিল—"আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ!"—তাহাতেই তাহার জীবনের গতি চিরদিনের মত নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, রামমোহনের এই কথাগুলিই তাঁহার পক্ষে গুরুমন্ত্র-স্বরূপ হইয়াছিল।

রামমোহনের 'রাজা' উপাধি সার্থক। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন: "The German name for prince is *furst*; in English first, he who is always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight. Such a *furst* was Rammohan, a true prince, a real Rajah, if Rajah also, like Rex, meant originally, the statesman, the man at the helm." অর্থাৎ—"প্রিন্স কথাটির জর্মন প্রতিশব্দ 'ভুরষ্ট'; ইংরেজি ফার্স্ট, তিনি যিনি সর্বদাই অগ্রণী, যিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়া লন্, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা। রামমোহন রায় এইরূপ ভুরষ্ট ছিলেন, একজন সত্যকার প্রিন্স, বাস্তবিক রাজা, যদি লাটিন রেক্স শব্দটির মত রাজার অর্থ আদিতে ছিল কর্ণধার।"

রামমোহনের জীবনেতিহাসে আমরা দেখিয়াছি, তিনি সকল বিষয়েই অগ্রণী, বিপদে তিনি নিঃসঙ্গ এবং আজীবন তিনি একজন সংগ্রামী যোদ্ধা। আবার ভারতের নবজাগরণের কর্ণধারও ছিলেন তিনিই। রামমোহন অবতার বা প্রেরিত পুরুষ নহেন। কিন্তু কর্মশক্তি, চিন্তাশক্তি আর হৃদয়ের শক্তি—সকল বিষয়েই রামমোহন সেদিন ছিলেন সকলের পুরোভাগে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রাজকীয় মর্যাদায় ভাস্বর।

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মরণ-সভা বহুবার হইয়াছে, তাঁহার কর্ম ও চিন্তার মূল্যায়ন ভারতবর্ষ তথা বাংলার বহু মনীষীই করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রামমোহনের ভাবধারার নিপুণ ভাষ্যকার হইলেন দুইজন: রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনকে 'The prophet of coming humanity' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাই রামমোহনের যোগ্যতম পরিচয়—অন্তত ইতিহাসের দিক দিয়া। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রসিদ্ধ উক্তিটি এইখানে মূল ইংরেজিতে উদ্ধৃত হইল:

"The period in which the Raja was born and grew up was, perhaps, the darkest age in modern Indian history. There were three bodies of culture, three civilisations, which were in conflict—the Hindu, the Moslem. and the Christian or the Occidental; and the question was how to find a point of concord, of unity, among these heterogeneous and warring forces. The origin of modern India lay there. The Raja by his finding of this point of concord and convergence became the Father and Patriarch of Modern India,—an India with composite nationality and a synthetic civilisation; and by the lines of convergence he laid down, as well as by the type of personality he developed in and through his own experience, he pointed the way to the solution of the larger problem of international culture and civilisation in human history, and became a precursor, an archetype, a prophet of coming Humanity. He laid the foundation of the true League of Nations in a League of National Cultures"

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রামমোহন রায়ের জন্ম ও জীবনকাল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগপরিবর্তনের সময়। সর্বত্রই তিনি আন্তর্জাতিক জাগরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম মানবপ্রেমের মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছিল। বলিতে গেলে, একটি আন্তর্জাতিক মন লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বের সকল জাতির সংস্কৃতিকে তিনি যথার্থ ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিসংঘের বেদীমূলে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দিলেন যে, এই পথেই আছে যাবতীয় আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান। রামমোহন মনীষার এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ রাজাকে *The prophet of coming humanity* বলিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের পটভূমিতে রামমোহনের ভাবধারার কী গভীর

প্রসার তাহা কবির রামমোহন-সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধে প্রকাশ পাইয়াছে। শিক্ষিত পাঠকের নিকট সেগুলি সুপরিচিত। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল রামমোহনের প্রতিভার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষের সকল চিন্তানায়কগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে আধুনিক চিন্তা ও জীবনের উৎস রাজা রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি আধুনিক যুগস্রষ্টা বলিয়া স্বীকৃত ও সম্পূজিত। কলিকাতা শহর হইতেই রামমোহন ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশে তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। মুঘল শাসনের সময়ে আমাদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় বিকাশ লাভ করিয়াছিল, রামমোহন ছিলেন তাহারই শেষ প্রতিনিধি। ভারত-মুসলিম সংস্কৃতির তিনি যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, তেমনি ইহার সহিত ভারত-য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে যে নব সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল, রামমোহন তাহারও অগ্রদূত ছিলেন। বর্তমান কালের ভারতবাসী এই সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকারী। রামমোহন একটি অভিনব বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন—তুলনামূলক ধর্ম (comparative religion)। ইহারই ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধ আজ সম্ভব হইয়াছে এবং ইহা বিশ্বমানবতার পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক বিচারদ্বারা রামমোহন বিশ্বমৈত্রীর বেদী রচনা করিয়া গিয়াছেন—পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়কে মিলিবার ও মিলাইবার পথও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং রামমোহন সমগ্র বিশ্বেরই মুক্তিদূত।"

রামমোহনের মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরে ব্রিস্টলে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানদিগের বাৎসরিক সভায় প্রতীচ্য পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার রামমোহন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি রামমোহনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন: "আজ আমি এ কথা বলিতে গৌরব অনুভব করি যে, আমি শুধু রামমোহনের একজন অনুরাগী নই; তাঁহার ধর্মসংস্কার বিষয়ে আমি তাঁহার একজন শিষ্য। ধর্মই ছিল রামমোহনের জীবনের চরম লক্ষ্য···তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় তুলনামূলক জ্ঞানের (comparative theology) জন্মদাতা

ছিলেন। রামমোহন জগতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের হিতকারী ব্যক্তি বলিয়া চিরকালই সমাদৃত হইবেন।"

পরে ম্যাক্সমূলারের এই বিখ্যাত বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ক্ষুদ্রায়তন হইলেও ম্যাক্সমূলারের 'রামমোহন-চরিত' একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এ ছাড়া, স্যর মনিয়েরর উইলিয়মস্, অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি ও সি, এফ, এণ্ড্রুজ প্রমুখ য়ুরোপের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ একবাক্যে রামমোহনকে মানবজাতির ভিতর সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "Rammohan Roy is the first really earnest investigator in the science of comparative theology which the world has produced—" মনিয়েরর উইলিয়ামস্-এর এই একটি কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেই রামমোহনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই প্রসঙ্গে রামমোহন তাঁহার বন্ধু ও শিষ্য নন্দকিশোর বসুকে যে কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ-যোগ্য। রাজা তাঁহাকে একদা বলিয়াছিলেন: "Ours is Universal theism"—"আমাদের ধর্ম বিশ্বজনীন"—এই কথাটির মধ্যেই রামমোহনের মহত্ত্বের অনেকখানি পরিচয় আছে।

তারপর একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হইল।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে আমরা পুরা একটি শতাব্দী অতিক্রম করিলাম। সভ্যতা তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ভারতবর্ষও নানা পরি-বর্তনের ভিতর দিয়া চলিয়া এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রামমোহন যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর একশত বৎসর পরে, সেই ভারতবর্ষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে শতবর্ষ পরে রামমোহনের মনীষার মূল্য নির্ধারণ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ রামমোহন-শতবার্ষিকী উৎসবের প্রথম বক্তৃতায় রামমোহনকে একটি নূতন উপাধিতে ভূষিত করিলেন। বলিলেন—রামমোহন 'ভারতপথিক'। রামমোহনের নূতন পরিচয় নির্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন:

"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে

নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান কারো স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পারচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে, যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে স্বীকৃতি আছে।"

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন মনুষ্যত্বের রাজশ্রীতে মণ্ডিত সেই মানুষ। এই 'ভারতপথিক' সেদিন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' দাঁড়াইয়া প্রথম উচ্চারণ করিলেন নিখিল মানবের ঐক্যবাণী। কিন্তু শতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন: "আজো কী আমরা রামমোহনকে শত্রু ব'লে অসম্মান করতে পারি?"

এই জিজ্ঞাসার উত্তর ভারতবাসী যেদিন দিতে পারিবে সেই দিন, এবং সেইদিন খুব দূরে নহে, তাদের নিকট মানবকুলতিলক, ভারতবর্ষের নবজাগৃতির বিরাট পুরুষ রামমোহনের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে।

ইতিহাসের পটে রামমোহনের চরিত্র, মনীষা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের যে দীপ্তি একদা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সেই দীপ্তি আজো অম্লান, কিন্তু আমাদের ধ্যান-ধারণায়, উপলব্ধিতে ও জীবনে নবযুগ-যজ্ঞহোতা, আধুনিক ভারতের স্রষ্টা সেই রামমোহন কোথায়? ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক রামমোহন। তাই অনেকের মনে এই ধারণা আজিও বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, তিনি ভারতবর্ষকে 'Europeanise' করিতে চাহিয়াছিলেন। এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিলাম রামমোহন ভারতবর্ষকে 'Europeanise' নয়, 'modernise' করিতে চাহিয়াছিলেন—চাহিয়াছিলেন তাহার চিন্তা ও কর্মকে গোষ্পদ হইতে মহাসমুদ্রাভিমুখে লইয়া যাইতে। তাঁহার সমস্ত পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, স্বোপার্জিত সম্পদ ও অতুলনীয় কর্মশক্তি তিনি নিয়োগ করিয়াছিলেন এই একটিমাত্র কাজে।

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা রামমোহনের প্রকৃত মহিমা এইখানেই। ইহাই সেই মানবগুরুর সত্য পরিচয়।

॥ পরিশিষ্ট ॥

(১)

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক পত্র।

To

**His Excellency the Right Hon'ble William Pitt,
Lord Amherst.**

My Lord,

Humbly reluctant as the natives of India are to obtrude upon the notice of Government the sentiments they entertain on any public measure, there are circumstances when silence would be carrying this respectful feeling to culpable excess. The present rulers of India, coming from a distance of many thousand miles to govern a people whose language, literature, manners, customs, and ideas are almost entirely new and strange to them, cannot easily become so intimately acquainted with their real circumstances, as the natives of the country are themselves. We should therefore be guilty of a gross dereliction of duty to ourselves, and afford our rulers just ground of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.

The establishment of a new Sanscrit School in Calcutta evinces the laudable desire of Government to improve the natives of India by education,—a blessing for which they must ever be grateful ; and every well-wisher of the human

race must be desirous that the efforts made to promote it, should be guided by the most enlightened principles, so that the stream of intelligence may flow into the most useful channels.

When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talents and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful Sciences, which the nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world.

While we looked forward with pleasing hope to the dawn of knowledge thus promised to the rising generation, our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude ; we already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened of the nations of the West with the glorious ambition of planting in Asia the arts and sciences of modern Europe.

We now find that the Government are establishing a Sanscrit School under Hindu Pundits to impart such knowledge as is already current in India. This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. The pupils will there acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men such as is already commonly taught in all parts of India.

The Sanscrit language, so difficult that almost a life time

is necessary for its perfect acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge ; and the learning concealed under the almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it. But if it were thought necessary to perpetuate this language for the sake of the portion of the valuable information it contains, this might be much more easily accomplished by other means than the establishment of a new Sanscrit College ; for there have been always and are now numerous professors of Sanscrit in the different parts of the country, engaged in teaching this language as well as the other branches of literature, which are to be the object of the new seminary. Therefore their more diligent cultivation, if desirable, would be effectually promoted by holding out premiums and granting certain allowances to those most eminent professors, who have already undertaken on their own account to teach them, and would by such rewards be stimulated to still greater exertion.

From these considerations, as the sum set apart for the instruction of the natives of India was intended by the Government in England, for the improvement of its Indian subjects, I beg leave to state, with due deference to your Lordship's exalted situation, that if the plan now adopted be followed, it will completely defeat the object proposed ; since no improvement can be expected from inducing young men to consume dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of Byakurun or Sanscrit Grammar. For instance, in learning to discuss such points as the following ; *khad*, signifying to eat, *khadati*, he or she or it eats. Query, whether does the word *khadati* taken as a whole convey the meaning *he*, *she* or *it eats*, or are separate parts of this meaning conveyed by distinct portions of the word ? As if in the English language it were asked, how much meaning is there in the

eat and how much in the *s* ? And is the whole meaning of the work conveyed by those two portions of it distinctly, or by them taken jointly ?

Neither can such improvement arise from such speculations as the following, which are the themes suggested by the Vedant :— in what manner is the soul absorbed in the deity ? What relation does it bear to the divine essence ? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence ; that as father, brother etc., have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world, the better. Again, no essential benefit can be derived by the student of the Meemansa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless on pronouncing certain passages of the Vedas and what is the real nature and operative influence of passages of the Veda, etc.

Again the student of the Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear etc.

In order to enable your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as above characterized, I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon, with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanscrit system of

education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature, But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry and Anatomy, with other useful Sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty, which I owe to my countrymen and also to that enlightened sovereign and legislature which have extended their benevolent care to this distant land actuated by a desire to improve its inhabitants and I, therefore, humbly trust you will excuse the liberty I have taken in thus expressing my sentiments to your Lordship.

Calcutta
The 11th December, 1823

I have the honour etc.
Rammohan Roy

পরিশিষ্ট (২)

॥ স্মৃতি-তর্পণ ॥

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

মহাজাগতিক আবর্তনের ফলে একটি স্মরণীয় বিধান পুনর্বার আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হৃদয়হীন প্রকৃতি কালচক্রের গতিতে অন্তহীন বিস্তারে প্রসারিত। শস্যে ও পুষ্পে ঋতু-উৎসব পুনরাবর্তিত হয়। গলিত স্বর্ণের বর্ণপ্রভায়, আকাশের সুদূরবিস্তারী নীলিমায়, জ্যোৎস্নালোকে ও রাত্রির রহস্যে প্রকৃতি অফুরন্ত ও পুনর্নবা। প্রকৃতির এই দৃশ্যপটের সম্মুখে মানুষের অবস্থিতি ছায়ার মতো। তাহার মানবিক মৌলিক সত্তা নিশ্চিহ্ন পরিণতিতে বিলুপ্ত। প্রকৃতির ভোজসভায় মানুষ অনাহূত আগন্তুক।

মহাকালের সমারোহে মানুষ অনিমন্ত্রিত; ক্রূর প্রত্যাখ্যানের আঘাতই তাহার বিধিলিপি। এক অন্ধ অবশ্য নিয়তির বেদীর সম্মুখে মানুষ বলিস্বরূপ উপস্থিত। কিন্তু তাহার চিন্তা ও কল্পনা কালের সীমানা অতিক্রম করিয়া প্রসারিত। আমাদের সৌরমণ্ডলের প্রান্তসীমা ছাড়াইয়া যে অগণিত জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাহার অস্পষ্ট আভাস আমরা পাই। মৃত্যুর নিস্তব্ধতা আমরা অন্তরের নিঃসঙ্গ একাকিত্বে অনুভব করি। আর সেই সঙ্গে উপলব্ধি করি স্বকীয় সত্তার সম্প্রসারণ; ভঙ্গুর মাটির অস্তিত্ব উত্তরণ করিয়া সত্তার এই যাত্রা। মৃত্যুর করুণ ও আশ্চর্য পবিত্রতা এক অব্যক্ত বেদনাবিধুর সৌম্য প্রশান্তিতে তাহার মনোজগৎ আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের সম্মুখীন দাঁড়াইয়া মানুষ অর্ধ-কৌতূহলে অর্ধ-ঔৎসুক্যে প্রকৃতির সুসম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্য অবলোকন করে। প্রকৃতির সঙ্গে শরিকানায় আবদ্ধ মানুষ জীবন ও মৃত্যুর খেলায় প্রবৃত্ত। অমরত্বের আবরণে মানুষ আপনাকে আবৃত করিয়া তোলে। জোয়ার-ভাঁটা এবং ঋতু-পরিবর্তনের নিশ্চয়তার মতোই,—শ্রদ্ধা ও অশ্রুজলে বিধৌত হইয়া মানুষের আত্মত্যাগ তাহার আনন্দ ও দুঃখের উদ্বেলতা বারে বারেই পৃথিবীতে দেখা দেয়। প্রকৃতি ও মানুষের এই পারস্পরিক সম্বন্ধের

দ্বারা উদ্বুদ্ধ অমরত্বে, যাহা প্রকৃতিকে প্রাণবান এবং মানুষকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে, সেই অমরত্বের সৌরমণ্ডলে, জাতি হিসাবে আমাদের স্থান কোথায়? মহামানবের আনন্দোৎসব, পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান আমরা কতটা পালন করিয়াছি? ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাপুরুষদের স্মৃতিপবিত্র মন্দির আমাদের কৈ?

হে ভারতবর্ষ! তীর্থপরিক্রমা ও দেববিগ্রহে অধ্যুষিত দেশ! তুষারতীর্থ হিমালয়ে এবং কলমন্দ্রিত নীলাম্বুতে তুমি দেবতাত্মার সন্ধানেই রত। এই দুই মহান্ অস্তিত্বের নিকট মানুষ আত্মবিমূঢ়, তাহার অন্য সব কিছুই এক ধূসর অবলুপ্তিতে বিলীন। আমাদের অন্তরের আকুতি সেই সর্বত্র বিরাজমান মহান্ সত্তার জন্য,—যাঁহার প্রয়োজন নাই কোনো মন্দিরের, কোনো তীর্থের। সমুদ্র, আকাশ ও পর্বতে ইতিহাসের চিহ্ন পড়ে না। ভারতবর্ষে মানুষের স্মৃতিসৌধও নাই। অসংখ্য বংশপরম্পরায় এই দেশে মানুষ জীবন-তীর্থ পরিক্রমা করিয়া মহাকালে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সময়ের দুরান্ত হইতে তাহাদের বাণীর অস্পষ্ট সাড়া পাই মাত্র। কালের ঘূর্ণাবর্তে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত; অচেতন সর্বব্যাপ্তিতে মানুষের সত্তাও বিলীন। হে ভারতবর্ষ! অবতার ও লীলার ভূমি! অজস্র অতিমানব ও অপমানবদের স্মরণার্থে তুমি অগণিত তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছ। ইহারাই ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে।

একবার আমি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রপীঠ রোমে ব্রহ্মণ্যসভ্যতার প্রতিনিধিরূপে যোগ দেওয়ার গৌরবময় সুযোগ পাইয়াছিলাম। বন্ধুগণ, আজ আমি বর্তমান ভারতের নব্যন্যায়ের উদ্গাতার স্মৃতিমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সেই রোমক সভ্যতার বাণী উচ্চারণ করিতেছি, সেই রীতি-পদ্ধতির কথা বলিতেছি, যাহার অনুশীলন ব্যক্তিকে বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে, সসীমকে অসীমে প্রতিষ্ঠা করে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে চিরন্তনী প্রকৃতির পৌনঃপুনিক আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে, স্মৃতি-অঞ্জলির জন্য পুণ্যতিথি উদ্‌যাপন করে, অতীত মহাপুরুষদের বীর্য ও তপঃসিদ্ধ অমরত্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রাগমণ্ডিত সুষমায় আপন অন্তরে অনুভব করে; এই অনুশীলন যে অনুভূতির উদ্রেক করে, তাহার প্রকাশের ভাষা নাই, অশ্রু-বৈদগ্ধ্যেরও অপেক্ষা গভীরতর সেই অনুভূতি।

সমুদ্র ও মহাশূন্যের সান্নিধ্য যেমন আমাদের প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাণরস আহরণ করিবার সাহায্য করে, অতীত মহাপুরুষদের জীবনস্মৃতিও মানুষকে তেমনি মহাকালের বিবর্তনের অংশভাগী হইতে সহায়তা করিয়া থাকে। মর্মরমূর্তি, তৈলচিত্র এবং স্মৃতিস্তম্ভের মাধ্যমে স্মরণতিথির পুণ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা পাশ্চাত্য নগরীগুলি মহামানবদের নিকট প্রাপ্ত নবজীবনের বাণী আবৃত্তি করিয়া থাকে।

মার্সাই নগরীর প্রতিষ্ঠার আড়াই হাজার বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, আমি সেখানে ইতিহাসের এক সনাতন পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পঁচিশ শতাব্দীর ইতিহাস আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন এক মাসে, এক সপ্তাহে, বা এক মুহূর্তে উন্মোচিত হইয়া গেল! আবালবৃদ্ধবণিতা সোৎসুক উদ্দীপনায় অতীতের পুনরুজ্জীবন যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারিল।

ভ্রাতৃমণ্ডলি, আমাদের অধ্যাত্মজীবনের জন্মদাতা যিনি, আজ তাঁহার স্মৃতিমন্দিরের বেদীমূলে সমবেত হইয়া আপনাদের নিকট অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সেই নবজাগরণের গোপন মন্ত্রটি শিখিয়া লউন। ইতিহাসের যাহা অবিনশ্বর তাহার অনুকরণে জাতির যাঁহারা বীর, যাঁহারা আত্মমেধী, যাঁহারা সন্ত, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার্থে নূতন নূতন তীর্থ ও তীর্থ-পরিক্রমা প্রবর্তিত করুন।

বিধাতার অমোঘ বিধান ইহাই। সুদূর ব্রিস্টলে রাজার সমাধি আমাদের সেই নির্দেশই দিতেছে। কে জানিত যে সপ্তর্ষি-নক্ষত্রের আলোতে ঝঞ্চাক্ষুব্ধ সেই শ্বেতদ্বীপে এক নূতন তীর্থযাত্রীর সমাধি স্থাপিত হইবে? কিন্তু তাহাই হইয়াছে; শত শত ভারতীয় নরনারী সেখানে গিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। নিস্তরঙ্গ জীবন সেখানে স্তব্ধ হইয়া আছে। শুধু এই সমাধির চারিপাশে তৃণে নবাঙ্কুরের চেতনা; আর সেই পাষাণ-আবরণের ভিতরে ...র অতীত শান্তি।

ব্রিস্টল আমাদের পথ-নির্দেশ দিতে পারে; সেই স্টেপলটন্ গ্রোভের একটি মঠ। গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত গণ্ডগ্রাম রাধানগরেই বা কেন অনুরূপ একটি স্মৃতিমন্দির গড়িয়া উঠিবে না? মানববাদের প্রথম অবতারের আবির্ভাব যেখানে হইয়াছিল, সেইখানেই বা হইবে না কেন? একদিনের হট্টগোলের মধ্যেই কি আমাদের স্মৃতিপূজার শেষ?

না, আমরা তাহা হইতে দিব না। আসুন, আমরা রামমোহন-মেলার প্রবর্তন করি। রামলীলার অনুকরণে আমরা সেখানে ভারত-ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন অভিনীত করিব, ধর্ম-মহামণ্ডলের অধিবেশন ঘটাইব, ভারতীয় কলাশিল্পের কারখানা-শিল্পের প্রদর্শনী বসাইব, সাহিত্য-সম্মেলন করিব। জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার জন্য রাধানগর অত্যন্ত উপযোগী স্থান। যে গৃহে রামমোহনের জন্ম হয়, যে ঘরে তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই গৃহের আবেষ্টনে আমরা বর্তমান ভারতের জনকের স্মৃতিপবিত্র এক নূতন তীর্থনগরীর পত্তন করিতে পারি, যেমন হইয়া উঠিয়াছে শেক্সপীয়রের ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন, এমার্সনের কনকর্ড্। শেক্সপীয়রের ষ্ট্রাটফোর্ড কবি-স্মৃতির সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; পৃথিবীর সর্বস্থান হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী অদ্যাবধি প্রতি বৎসর সেখানে গিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকে। আমরা, হিন্দুরা, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অনুযায়ী এক নূতন পীঠস্থান পত্তন করিয়া বর্তমান মন্বন্তরের মনু বা প্রজাপতি রাজা রামমোহনের নামের সহিত যুক্ত করিয়া এক মহামেলার উদ্বোধন করিতে পারি।

পাশ্চাত্যের বীরপূজার রীতির এবং ব্রিটিশ জাতির তথ্যসংরক্ষণ প্রবৃত্তির জন্য, আমাদের সৌভাগ্যবশতই রাজার কতিপয় ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত হইয়া আছে। যে পাগড়ী ও উপবীত রাজা আমরণ ধারণ করিয়াছিলেন, আমাদের অনেকেরই তাহা স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। রাজার করোটির ছাপ ও মাপ রহিয়াছে; তাঁহার ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যও আছে। চুম্বকের মতো এইগুলির আকর্ষণী শক্তি; আমরা ঐগুলি সংরক্ষণ করিবার উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিতে পারি।

এই কলিকাতা বহুতর স্মৃতিতে সমৃদ্ধ। রাজা রামমোহনের স্মৃতি তন্মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁহার স্মৃতিমন্দির তাঁহার ঐতিহাসিক অবিনশ্বরতা রক্ষা করিবে। সত্য, সুন্দর ও বীর্য, অনুপ্রেরণার এই কয়টি বিষয় স্বকীয় শক্তিতেই বাড়িয়া থাকে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মানবদের সংস্পর্শ পাইতেই হইবে। হাটে-বাজারে, যাদুঘরে ও শিল্পসংরক্ষণশালায়, স্কুলে, পার্কে ও প্রেক্ষাগৃহে মহাপুরুষদের স্মৃতিচিহ্নগুলি রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটি কেন্দ্রীয় রামমোহন লাইব্রেরি, রামমোহন ক্লাব, সাহিত্যিক সামাজিক

ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মালোচনার ও তুলনামূলক সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহার সার্কুলার রোডের বাড়ি, যেখানে 'আত্মীয় সভা'র প্রথম অধিবেশন হয় এবং রমাপ্রসাদ রায়ের বাগানবাড়ি উপরোক্ত উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবতার-অধ্যুসিত এই দেশে ইহার ফলে এক নূতন মানববাদের পত্তন হইবে। ইতিহাস যে ক্ষণভঙ্গুর নয়, রাজার জীবনী ও বাণী আমাদের অন্তরে সেই প্রতীতি জাগ্রত করুক। রাজাই তো প্রথম ভারতীয়, যিনি ভারতবর্ষকে ফরাসী-বিপ্লবের বাণী ও আলোয় উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

তিন বৎসর পূর্বে ইতালির সান্তা-ক্রোচেতে মহাকবি দান্তের সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, প্রিন্স্ আর্থার যেমন আভালন দ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আমাদের রাজাও তেমনি একদিন সাত সমুদ্র পার হইয়া তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন।*

* ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যখন রোমে অনুষ্ঠিত 'কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালস্'-এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধিটিও দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তারপর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিখ্যাত Dawn পত্রিকায় 'Perpetuation of Historic Memories'-শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহাই এখানে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্রনাথের কোনো পুস্তকে সঙ্কলিত হয় নাই।

অনুবাদক : শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ

॥ গ্রন্থ-নির্দেশিকা ॥

১। **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়**—নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

২। **ভারতপথিক রামমোহন** —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। **রামমোহন-প্রসঙ্গ** —প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৪। **রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন**—যোগানন্দ দাস।

৫। **রামমোহন রায়ের রচনাবলী**—রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত।

৬। *The English Works of Raja Rammohun Roy*—Ed. by Dr. Kalidas Nag & D. Burman.

৭। *Selections from Official Letters and Documents relating to the life of Raja Rammohun Roy* —R. Chanda & J. K. Mazumder.

৮। *Raja Rammohun Roy : Progressive Movements in India* —J. K. Mazumder.

৯। *History of Political Thought from Rammohun to Dayananda*—Dr. B. B. Mazumder.

১০। *The Father of Modern India* : Commemoration Volume of the R. Roy Centenary Celebrations —Ed. by S. C. Chakravarty.

১১। *Rammohun Roy : The man and His Work*— Edited by—Amal Home

১২। *Rammohun, the Universal Man*—Dr. B. N. Seal.

১৩। *The History of Brahmo Samaj*—Sivanath Sastri.

১৪। *The History of Serampore Mission*—J. C. Marshman.

১৫। *Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (3rd Edn.) —S. D. Collet. —Edited by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli

১৬। *The Last Days in England of Raja Rammohun Roy* —Mary Carpenter.

১৭। *Rammohun Roy and America*—Adrienne Moore.